

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআনের আলোকে শয়তান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান নিশা

রোলঃ 23100120523

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআনের আলোকে শয়তান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান নিশা

রোলঃ 23100120523

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কোরআনের আলোকে শয়তান ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান নিশা, আইডিঃ 23100120523 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ শারীফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কোরআনের আলোকে শয়তান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারীফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নুসরাত জাহান নিশা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

নুসরাত জাহান নিশা

আইডিঃ 23100120523

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.সূচনা	6
২.শয়তান শব্দের অর্থ ও পরিচয়	9
৩.ইবলিসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস	12
৪.জিন জাতির সৃষ্টি ও প্রকৃতি.....	20
৫.জিন সৃষ্টির হাকীকত	27
৬.আদম (আ.) ও ইবলিসের ঘটনা	30
৭.সীরাতের আলোকে শয়তানের চক্রান্ত	36
৮.ওয়াসওয়াসার বাস্তবতা: ইবাদত, পবিত্রতা ও হতাশার সূক্ষ্ম ফাঁদ.....	39
৯.মানুষের অন্তরে শয়তানের প্রবেশপথ	45
১০.শয়তানের কৌশল ও প্রতারণা	50
১১.শয়তানের প্রভাবে সমাজে অশান্তির বাস্তবতা	59
১২.পরিবার ধ্বংসে শয়তানের ভূমিকা ও নৈতিক বিচ্যুতির সামাজিক বাস্তবতা	63
১৩.যুবসমাজ ও আধুনিক ফিতনা.....	72
১৪.মোবাইল, ইন্টারনেট ও শয়তানের প্রভাব.....	75
১৫.অহংকার, হিংসা ও হতাশা	79
১৬.জাদু, বদনজর ও জিনের প্রভাব:শয়তানের অদৃশ্য মাধ্যম.....	82
১৭.শয়তানের চূড়ান্ত লক্ষ্য.....	84
১৮.রুকিয়াহ কী: পরিচয় ও গুরুত্ব.....	86
১৯.রুকিয়াহ সূরা ও দোয়া	88
২০.বাধ্যতামূলক হিফাজতের আমল	92
২১.চেকলিস্ট	96
২২.কিয়ামতের দিন শয়তানের পরিণতি	98
২৩.উপসংহার	100

২৪. ব্যবহৃত রেফারেন্সসমূহ.....	102
--------------------------------	-----

১.সূচনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, হেদায়েত ও গোমরাহির পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচার নির্দেশনা দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, যিনি আমাদেরকে সত্য পথের দিশা দেখিয়েছেন।

মানবজীবন এক দীর্ঘ পরীক্ষার নাম, যেখানে দৃশ্যমান শত্রুর চেয়ে অদৃশ্য শত্রুর প্রভাব অনেক গভীর ও বিপজ্জনক। এই অদৃশ্য শত্রুর নাম হলো শয়তান। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জানা যায়, সে মানুষের ঈমান, চিন্তা ও আমলকে ধীরে ধীরে নষ্ট করার জন্য সর্বদা সক্রিয়।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে রহস্যময় অথচ বাস্তব শত্রুর নাম—শয়তান। তাকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু তার প্রভাব মানুষের অন্তর, চিন্তা, সমাজ, পরিবার ও সভ্যতার গভীরে প্রবাহিত হয়। বাতাস যেমন অদৃশ্য থেকেও ঝড় তোলে, তেমনি শয়তান মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসার ঝড় সৃষ্টি করে। সে মানুষের কানে ফিসফিস করে, গুনাকে সুন্দর করে তোলে, সত্যকে কঠিন আর মিথ্যাকে সহজ মনে করায়।

ইসলামে শয়তান কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়; বরং সে আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী মানুষের “প্রকাশ্য শত্রু”। তার সবচেয়ে বড় যুদ্ধ মানুষের অন্তরকে কেন্দ্র করে। সে মানুষের হৃদয়ে অহংকার, হিংসা, লোভ, হতাশা, কামনা, সন্দেহ ও অবাধ্যতার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ইতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে আজকের অশ্লীলতা, সুদ, পরিবার ভাঙন, আত্মহত্যা, নাস্তিকতা ও নৈতিক বিপর্যয়ের পেছনে তার প্ররোচনা কাজ করছে।

ইমাম ইবনুল জাওয়ী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “তালবিস্ ইবলিস”-এ দেখিয়েছেন, শয়তান কেবল পাপীদেরই ধোঁকা দেয় না; বরং সে আলেম, আবেদ, দাঈ, যুবক, নারী, ধনী, গরিব—সবার কাছেই ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। সে প্রত্যেক মানুষের দুর্বলতা বুঝে তার কাছে আসে। কারো কাছে অহংকারের দরজা দিয়ে, কারো কাছে কামনার দরজা দিয়ে, কারো কাছে হতাশার দরজা দিয়ে, আবার কারো কাছে ধর্মীয় বাড়াবাড়ির দরজা দিয়ে।

অন্যদিকে “জিন ও শয়তানের জগৎ” গ্রন্থে জিন জাতির বাস্তবতা, শয়তানের কৌশল, মানুষের উপর তাদের প্রভাব এবং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আত্মরক্ষার উপায় অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, জিন ও শয়তানের জগৎ রহস্যময় হলেও ইসলামে তা কুসংস্কার বা ভয়ের বিষয় নয়; বরং ঈমান, জ্ঞান ও আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে মোকাবিলা করার বিষয়।

বর্তমান যুগে শয়তানের ফিতনা আরও সূক্ষ্ম হয়েছে। একসময় মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তাকে মরুভূমি পাড়ি দিতে হতো, আজ সে একটি মোবাইল স্ক্রিনের ভেতরেই মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেছে। রাতের নীরবতায়, একাকীত্বের মুহূর্তে, অসতর্ক স্ক্রলিংয়ের মাঝে, নিষিদ্ধ কনটেন্টের আস্থানে, অহংকারময় প্রদর্শনীতে এবং অশ্লীল বিনোদনের মাধ্যমে সে মানুষের হৃদয়কে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিচ্ছে।

একটি ছোট উদাহরণ ধরা যাক। রাফি নামের এক তরুণ রাতে ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরল। ফজরের আগে একটু বিশ্রাম নেবে ভেবে মোবাইল হাতে নিল। হঠাৎ একটি নোটিফিকেশন—“একটু দেখুন, মন ভালো হয়ে যাবে।” একটি ভিডিও থেকে আরেকটি ভিডিও, একটি ক্লিক থেকে আরেকটি ক্লিক। যখন ফজরের আজান হলো, তার অন্তর ক্লান্ত, চোখ ভারী এবং আত্মা শূন্য। শয়তান কখনো হঠাৎ ধ্বংস করে না; সে ধীরে ধীরে মানুষকে গাফেল বানায়। প্রথমে সময় নষ্ট, পরে সালাতে অলসতা, তারপর অন্তরে অন্ধকার—এভাবেই ওয়াসওয়াসা মানুষের আত্মাকে দুর্বল করে।

ওয়াসওয়াসা (الوسوسة) হলো শয়তানের সবচেয়ে সূক্ষ্ম অস্ত্র। এটি এমন এক অদৃশ্য ফিসফিস, যা মানুষের অন্তরে সন্দেহ, কুপ্রবৃত্তি, হতাশা বা গুনাহের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। কুরআনে শয়তানকে বলা হয়েছে—

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
“যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।”

শয়তানের কাজ অনেকটা অদৃশ্য ভাইরাসের মতো। প্রথমে বোঝা যায় না, কিন্তু ধীরে ধীরে অন্তরের “ঈমানের ব্যাটারি” দুর্বল হয়ে যায়। লজ্জা কমে যায়, গুনাহ সহজ মনে হয়, কুরআন তিলাওয়াতে অলসতা আসে, সালাতে মনোযোগ হারিয়ে যায়। অথচ সে কখনো জোর করে না; বরং মানুষকে এমন অনুভব করায় যেন এসব চিন্তা তার নিজের।

তবে ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই—আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধু শত্রুর পরিচয় দেননি; বরং আত্মরক্ষার পূর্ণাঙ্গ পথও দেখিয়েছেন। কুরআন, সালাত, যিকির, তাওবা, ইস্তিগফার, আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস, এবং রুকইয়াহ—এসবই একজন মুমিনের আধ্যাত্মিক ঢাল।

এই লিখায় আমরা শয়তানের প্রকৃতি, তার কৌশল এবং মানবজীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও সালাফদের ব্যাখ্যার আলোকে আলোচনা করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

২. শয়তান শব্দের অর্থ ও পরিচয়

মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক শত্রু এসেছে, যাদের অস্তিত্ব মানুষ চোখে দেখেছে, যুদ্ধ করেছে, পরাজিত করেছে। কিন্তু এমন এক শত্রু আছে, যে মানুষের জন্মের আগ থেকেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে; যাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যার প্রভাব মানুষের অন্তর, চিন্তা, আচরণ ও সমাজের প্রতিটি স্তরে অনুভূত হয়। সেই অদৃশ্য শত্রুর নাম—শয়তান।

“শয়তান” শব্দটি আরবি “شطن” ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—দূরে সরে যাওয়া, বিচ্যুত হওয়া বা সত্যপথ থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া। যেহেতু ইবলিস আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ ও আনুগত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, তাই তাকে “শয়তান” বলা হয়। আবার “ইবলিস” শব্দের অর্থ—হতাশ, নিরাশ বা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। কারণ আল্লাহর অভিশাপের পর সে চিরতরে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ে পড়ে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
(সূরা আল-বাকারাহ : ৩৪)

অর্থ: “আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।”

এই একটি আয়াতেই শয়তানের পরিচয়ের গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। ইবলিসের পতনের কারণ ছিল তার জ্ঞানহীনতা নয়; বরং অহংকার। সে আল্লাহকে চিনত, ইবাদত করত, জান্নাতের পরিবেশে ছিল, কিন্তু নিজের অহংকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। এখান থেকেই বোঝা যায়—মানুষকে ধ্বংস করার জন্য সবসময় অজ্ঞতা প্রয়োজন হয় না; কখনো কখনো অহংকারই সবচেয়ে বড় ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তায়সীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবলিস ছিল অত্যন্ত ইবাদতকারী জিন। তার ইবাদত ও জ্ঞানের কারণে তাকে ফেরেশতাদের সমমর্যাদার পরিবেশে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তার অন্তরের লুকিয়ে থাকা অহংকার প্রকাশ পেল। সে মনে করল—“আমি আগুনের তৈরি, আর আদম মাটির তৈরি; তাই আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”

কুরআনে তার সেই অহংকারপূর্ণ বক্তব্য এসেছে—

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
(সূরা আল-আ'রাফ : ১২)

অর্থ: “আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।”

এই অহংকারই ছিল পৃথিবীর প্রথম গুনাহ। ইমাম ইবনুল জাওয়ী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “তালবিস ইবলিস” - এ লিখেছেন, শয়তানের সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র হলো—মানুষকে নিজের সম্পর্কে অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা দেওয়া। মানুষ যখন মনে করে “আমি ভুল করতে পারি না”, তখনই সে ধ্বংসের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণিত আছে—একজন আলেম বহু বছর ইবাদত করতেন। মানুষ তাকে অত্যন্ত নেককার মনে করত। ধীরে ধীরে তার অন্তরে অনুভূতি জন্ম নিল—“আমি অন্যদের চেয়ে বেশি ইবাদতকারী।” এই ছোট অহংকারই তার অন্তরকে অন্ধকার করতে শুরু করল। একদিন সে একজন গুনাহগার মানুষকে ঘৃণাভরে বলল, “আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না।” তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা এলো—তুমি কে, যে আমার রহমতের ফয়সালা করবে? সেই আলেমের অহংকার তার বহু বছরের ইবাদতকে বিপদের মুখে ফেলে দিল। এই ঘটনাটি বোঝায়, শয়তান অনেক সময় সরাসরি গুনাহের দরজা দিয়ে আসে না; বরং নেক আমলের ভেতরেও অহংকার ঢুকিয়ে দেয়।

শয়তানের আরেকটি বড় কৌশল হলো—মানুষকে ধীরে ধীরে বিভ্রান্ত করা। সে কখনো শুরুতেই বড় গুনাহে ডাকে না। যেমন একটি ছোট আগুন ধীরে ধীরে পুরো বন জ্বালিয়ে দেয়, তেমনি শয়তান ছোট গুনাহ, ছোট অবহেলা, ছোট ওয়াসওয়াসা দিয়ে মানুষের অন্তরকে দুর্বল করতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ
(সহীহ আল-বুখারী : ৩২৮১, সহীহ মুসলিম : ২১৭৫)

অর্থ: “নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়।”

এই হাদীস বোঝায়, শয়তান মানুষের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। সে মানুষের দুর্বলতা বোঝে, ভয় বোঝে, লোভ বোঝে, একাকীত্ব বোঝে। কেউ যখন দুঃখে ভেঙে পড়ে, তখন সে হতাশা বাড়িয়ে দেয়। কেউ যখন সফল হয়, তখন সে অহংকার ঢুকিয়ে দেয়। কেউ যখন একা থাকে, তখন সে হারাম চিন্তা নিয়ে আসে।

বর্তমান যুগে শয়তানের কাজ আরও সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। আগে মানুষকে গুনাহের দিকে নিতে সময় লাগত, আজ একটি মোবাইল স্ক্রিনই যথেষ্ট। রাতের নীরবতায় একজন যুবক যখন মোবাইল স্ক্রল করতে থাকে, তখন শয়তান তাকে বলে—“আরেকটা ভিডিও দেখো”, “আরেকটু সময় থাকো”, “এটা তো বড় কিছু না।” ধীরে ধীরে সালাত কমে যায়, কুরআন দূরে সরে যায়, অন্তর শক্ত হয়ে যায়। শয়তানের কাজই হলো মানুষকে এমনভাবে ধ্বংস করা, যাতে মানুষ বুঝতেই না পারে যে সে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।

“জিন ও শয়তানের জগৎ” গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, শয়তান মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে, কিন্তু সে কখনো মানুষকে বাধ্য করতে পারে না। সে শুধু আহ্বান করে, সাজিয়ে দেখায়, প্ররোচনা দেয়। সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত মানুষের নিজের।

কিয়ামতের দিন শয়তান নিজেই বলবে—

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي

(সূরা ইবরাহীম : ২২)

অর্থ:“আমার তোমাদের উপর কোনো জোর ছিল না; আমি শুধু তোমাদের ডেকেছিলাম, আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে।”

এই আয়াত মানুষের জন্য গভীর শিক্ষা বহন করে। শয়তানের সবচেয়ে বড় শক্তি তার প্রতারণা, আর মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো আল্লাহর স্মরণ। যে অন্তর কুরআনের আলোয় জীবিত থাকে, সেখানে শয়তানের অন্ধকার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

৩.ইবলিসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস

সৃষ্টিজগতের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত এবং সবচেয়ে করুণ চরিত্রগুলোর একটি হলো ইবলিস। সে এমন এক সৃষ্টি, যে একসময় ইবাদত, জ্ঞান ও আনুগত্যের কারণে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছেছিল; কিন্তু একটি অহংকার, একটি অবাধ্যতা এবং একটি বিদ্রোহ তাকে আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বিতাড়িত করে দেয়। তার ইতিহাস শুধু একটি অতীত কাহিনী নয়; বরং প্রতিটি মানুষের জীবনের জন্য এক গভীর সতর্কবার্তা। কারণ ইবলিসের পতনের মধ্যে অহংকার, হিংসা, আত্মপ্রবঞ্চনা, গুনাহ এবং তওবা থেকে দূরে থাকার ভয়াবহ পরিণতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কুরআন মাজীদে ইবলিসের ঘটনা একাধিক স্থানে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
(সূরা আল-কাহফ : ৫০)

অর্থ:“আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস করল না। সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত; অতঃপর সে তার রবের আদেশ অমান্য করল।”

এই আয়াত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে, ইবলিস ফেরেশতা ছিল না; বরং সে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে তার ইবাদত ও আনুগত্য এত বেশি ছিল যে সে ফেরেশতাদের সাথেও অবস্থান করার মর্যাদা পেয়েছিল।

তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে তাবারী, তালবিস ইবলিস, জিন ও শয়তানের জগৎ এবং আদ-দা ওয়াদ দাওয়া-সহ বহু ইসলামী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবলিস ছিল অত্যন্ত ইবাদতকারী। বহু বছর ধরে সে আল্লাহর ইবাদত করেছিল। তার জ্ঞান, ইবাদত ও আনুগত্যের কারণে তাকে সম্মানিত করা হতো। কিন্তু তার অন্তরের গভীরে একটি মারাত্মক রোগ লুকিয়ে ছিল—অহংকার।

যখন আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন এবং ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন তাকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য, তখন সব ফেরেশতা বিনা দ্বিধায় সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলিস নিজের অহংকারের কারণে অস্বীকার করল।

আল্লাহ বলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
(সূরা আল-বাকারাহ : ৩৪)

অর্থ: “আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।”

ইবলিস তখন যুক্তি দেখিয়ে বলল—

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
(সূরা আল-আ'রাফ : ১২)

অর্থ: “আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।”

এই আয়াত ইবলিসের অন্তরের প্রকৃত রোগ প্রকাশ করে। সে আল্লাহর আদেশের সামনে নিজের যুক্তিকে বড় মনে করেছিল। সে মনে করেছিল, আগুন মাটির চেয়ে উত্তম; তাই আগুন থেকে সৃষ্ট সত্তাও শ্রেষ্ঠ। অথচ আল্লাহর আদেশের সামনে কোনো যুক্তি, কোনো অহংকার, কোনো ব্যক্তিগত মতামতের মূল্য নেই।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন, ইবলিস প্রথম সৃষ্টি যে আল্লাহর আদেশের সামনে নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছিল। আর এখান থেকেই “অহংকারের দর্শন” শুরু হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
(সহীহ মুসলিম : ৯১)

অর্থ: “যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

এই হাদীস ইবলিসের ইতিহাসের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কারণ ইবলিসের পতনের মূল কারণ ছিল অহংকার। সে আল্লাহর ইবাদত করেছিল, কিন্তু বিনয় হারিয়ে ফেলেছিল।

ইবলিস শুধু অবাধ্যতাই করেনি; বরং সে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্তও হয়নি। আদম (আ.) ভুল করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, কিন্তু ইবলিস তওবা না করে বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছিল। সে বলেছিল—

فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ
(সূরা আল-আ'রাফ : ১৬)

অর্থ: “আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব।”

এখানে ইবলিস নিজের অপরাধের দায়ও আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। এটি শয়তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—সে মানুষকে নিজের ভুল স্বীকার না করতে শেখায়।

এরপর ইবলিস আল্লাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চাইল—

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝

(সূরা আল-আ'রাফ : ১৪-১৫)

অর্থ: “সে বলল, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।”

অবকাশ পাওয়ার পর সে প্রতিজ্ঞা করল—

ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
(সূরা আল-আ'রাফ : ১৭)

অর্থ: “তারপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে।”

তাফসীরবিদরা বলেন, এর অর্থ হলো—শয়তান মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। কখনো দুনিয়ার লোভ দিয়ে, কখনো ভয় দিয়ে, কখনো কামনা দিয়ে, কখনো হতাশা দিয়ে, কখনো আবার নেক আমলের মধ্যেও রিয়া ও অহংকার ঢুকিয়ে।

“তালবিস ইবলিস” গ্রন্থে বলা হয়েছে, শয়তান প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের জন্য আলাদা ফাঁদ তৈরি করে। আলেমদের জন্য অহংকার, যুবকদের জন্য কামনা, ধনীদের জন্য লোভ, দরিদ্রদের জন্য হতাশা, আবেদদের জন্য রিয়া, আর সাধারণ মানুষের জন্য গাফিলতি।

ইবলিসের প্রতারণার একটি ভয়ংকর উদাহরণ হলো বার্সিসার ঘটনা। বহু বছর ইবাদতকারী এক আবেদকে সে ধীরে ধীরে গুনাহে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কুফরিতে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ছোট দরজা, পরে বড় গুনাহ—এভাবেই শয়তান মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ
(সহীহ আল-বুখারী : ৩২৮১, সহীহ মুসলিম : ২১৭৫)

অর্থ: “নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হয়।”

এই হাদীস বোঝায়, শয়তান মানুষের খুব কাছাকাছি থাকে। সে মানুষের দুর্বলতা বোঝে, ক্লান্তি বোঝে, একাকীত্ব বোঝে। তাই সে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে তখন, যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে।

বর্তমান যুগে ইবলিসের কৌশল আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। আগে মানুষকে গুনাহে নিতে সময় লাগত; আজ একটি মোবাইল স্ক্রিনই যথেষ্ট। অশ্লীলতা, হারাম সম্পর্ক, অহংকারময় জীবনপ্রদর্শন, মাদক, সুদ, হতাশা—এসবের মাধ্যমে শয়তান মানুষের অন্তরকে ধীরে ধীরে অন্ধকার করে দেয়।

কিন্তু ইবলিসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো—সে আল্লাহর বান্দাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান নয়। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ عِبَادِي لَأَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
(সূরা আল-হিজর : ৪২)

অর্থ: “নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।”

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ, সালাত, কুরআন, যিকির ও তওবাকে আঁকড়ে ধরবে, তার উপর শয়তান স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

কিয়ামতের দিন ইবলিস তার অনুসারীদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে। সে বলবে—

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي
(সূরা ইবরাহীম : ২২)

অর্থ: “আমার তোমাদের উপর কোনো জোর ছিল না; আমি শুধু তোমাদের ডেকেছিলাম, আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে।”

ইবলিসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হলো—সে শুধু নিজে পথভ্রষ্ট হয়েই থেমে থাকেনি; বরং সে প্রতিজ্ঞা করেছে পুরো মানবজাতিকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার। তাই কুরআনে তাকে “মানুষের প্রকাশ্য শত্রু” বলা হয়েছে।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
(সূরা ফাতির : ৬)

অর্থ: “নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তোমরাও তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো।”

এই আয়াতের গভীরতা হলো—মানুষ অনেক সময় শয়তানকে ভয়ংকর মনে করলেও তাকে সত্যিকারের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে না। মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেয়, সতর্ক থাকে; কিন্তু শয়তানের ব্যাপারে গাফিলতি করে। অথচ সে মানুষের ঈমান, পরিবার, সমাজ ও আখিরাত ধ্বংস করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

শয়তানের চক্রান্ত গ্রহণে উল্লেখ করা হয়েছে, শয়তানের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—সে মানুষের কাছে গুনাহকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে। প্রথমে সে গুনাহকে “স্বাভাবিক” বানায়, পরে “অভ্যাস” বানায়, তারপর সেটাকে মানুষের পরিচয়ের অংশে পরিণত করে দেয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
(সূরা আন-নাহল : ৬৩)

অর্থ: “শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের কাছে সুশোভিত করে দিয়েছে।”

এই আয়াত বর্তমান যুগে আরও বাস্তব মনে হয়। অনেক মানুষ হারামকে আধুনিকতা মনে করে, অহংকারকে আত্মসম্মান মনে করে, অশ্লীলতাকে স্বাধীনতা মনে করে, সুদকে উন্নতি মনে করে। শয়তানের বড় কৌশলই হলো—মানুষ যেন গুনাহকে আর গুনাহ মনে না করে।

ইবলিসের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হিংসা। আদম (আ.)-এর প্রতি ইবলিসের হিংসাই তাকে বিদ্রোহে ঠেলে দেয়। সে মেনে নিতে পারেনি যে আল্লাহ আদমকে সম্মানিত করেছেন। তাই হিংসা শুধু একটি মানসিক দুর্বলতা নয়; বরং এটি ইবলিসী চরিত্রের অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطْبَ
(সুনানে আবু দাউদ : ৪৯০৩)

অর্থ: “তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।”

তাফসীরবিদরা বলেন, ইবলিসের পতনের পেছনে তিনটি বড় কারণ ছিল—অহংকার, হিংসা এবং অবাধ্যতা। আর এই তিনটি রোগ আজও মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করছে।

শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তি-তে উল্লেখ করা হয়েছে, শয়তান মানুষের অন্তরে সরাসরি বড় গুনাহ ঢুকায় না; বরং ধীরে ধীরে ঈমান দুর্বল করে। প্রথমে নামাজে অলসতা, পরে

যিকিরে গাফিলতি, তারপর হারাম দৃষ্টি, এরপর অন্তরের কঠোরতা—এভাবেই মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন, শয়তান মানুষের জন্য ছয়টি ধাপ তৈরি করে। প্রথমে কুফরির দিকে ডাকে, না পারলে বিদআতের দিকে, না পারলে বড় গুনাহের দিকে, না পারলে ছোট গুনাহে ব্যস্ত রাখে, না পারলে বৈধ কাজে অতিরিক্ত ব্যস্ত করে নেক আমল থেকে দূরে রাখে। অর্থাৎ শয়তান কখনো হাল ছাড়ে না।

বর্তমান যুগে ইবলিসের ইতিহাস যেন নতুন রূপে ফিরে এসেছে। আগে শয়তান মানুষের কানে ফিসফিস করত; এখন সে মোবাইল স্ক্রিন, সোশ্যাল মিডিয়া, হারাম বিনোদন, অহংকারপূর্ণ প্রদর্শনী ও নোংরা কনটেন্টের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করছে। রাতের অন্ধকারে একটি স্ক্রিনের আলো অনেক সময় মানুষের অন্তরের আলো নিভিয়ে দেয়। মানুষ ভাবে—“আরেকটু দেখি”, “আরেকটু সময় কাটাই”; অথচ ধীরে ধীরে সালাত, কুরআন, যিকির ও অন্তরের প্রশান্তি হারিয়ে যেতে থাকে।

এই কারণেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন—

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
(সূরা আল-বাকারাহ : ১৬৮)

অর্থ: “তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।”

এখানে “পদাঙ্ক” শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শয়তান মানুষকে এক ধাপে ধ্বংস করে না; বরং ধাপে ধাপে নিয়ে যায়। একটি হারাম দৃষ্টি, একটি গোপন গুনাহ, একটি ছোট অবহেলা—এসবই পরে বড় ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইবলিসের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো—ইবাদত করলেই মানুষ নিরাপদ নয়, যদি তার অন্তরে বিনয় না থাকে। ইবলিস বহু ইবাদত করেছিল, কিন্তু অহংকার তাকে

ধ্বংস করেছে। তাই একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শুধু আমল নয়; বরং বিনয়, তওবা, আল্লাহভীতি ও আত্মশুদ্ধি।

ইবলিসের ইতিহাস তাই কেবল অতীতের গল্প নয়; বরং প্রতিটি মানুষের অন্তরের যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি। যে মানুষ অহংকার, হিংসা, গাফিলতি ও গুনাহকে নিজের জীবনে জায়গা দেয়, সে ধীরে ধীরে ইবলিসের পথেই হাঁটতে শুরু করে। আর যে ব্যক্তি বিনয়, তওবা ও আল্লাহর স্মরণকে আঁকড়ে ধরে, সে শয়তানের প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে।

৪. জিন জাতির সৃষ্টি ও প্রকৃতি

মানবচক্ষুর আড়ালে এক বিস্ময়কর ও বাস্তব জগত রয়েছে, যেখানে জিন জাতি বসবাস করে। ইসলামের দৃষ্টিতে জিন কোনো কল্পকাহিনী নয়; বরং আল্লাহর এক বাস্তব সৃষ্টি, যাদের অস্তিত্ব কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তারা মানুষের মতোই বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং নৈতিক দায়িত্বে আবদ্ধ একটি জাতি, যারা পরীক্ষার জগতে অবস্থান করছে। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে জিন জাতি আল্লাহ তাআলার এক অদৃশ্য সৃষ্টি, যাদের প্রকৃতি, ক্ষমতা ও শ্রেণি বিভিন্ন ধরনের। তারা সবাই এক রকম নয়; বরং তাদের মধ্যে নেককার, অবাধ্য, দুর্বল ও অত্যন্ত শক্তিশালী—বিভিন্ন শ্রেণি বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَنَا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ

(সূরা আল-জিন : ১১)

অর্থ: “আমাদের মধ্যে কিছু নেককার এবং কিছু এর বিপরীত।”

তাফসীর ইবনে কাসীর অনুযায়ী, এই আয়াত স্পষ্ট করে যে জিনদের মধ্যেও ঈমানদার ও কাফির উভয় শ্রেণি রয়েছে। তাই সব জিন শয়তান নয়; বরং অবাধ্য জিনদেরই “শয়তান” বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
(সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬)

অর্থ: “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।”

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়, জিন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের পরীক্ষা।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ
(সূরা আর-রহমান : ১৫)

অর্থ: “আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে।”

এবং—

وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ
(সূরা আল-হিজর : ২৭)

অর্থ: “আর আমরা এর আগে জিনকে সৃষ্টি করেছি দাহকারী আগুন থেকে।”

তাফসীরবিদদের মতে “মারিজ” বলতে এমন আগুন বোঝানো হয়েছে যা ধোঁয়াযুক্ত, অস্থির এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। এটি জিনের স্বভাব—দ্রুত গতি, সূক্ষ্ম অস্তিত্ব এবং অদৃশ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে।

তাফসীরে ইবনে কাসীর সহ অন্যান্য তাফসীরে উল্লেখ আছে, জিন জাতি মানুষের আগেই সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবীতে বসবাস করে। তারা অদৃশ্য হলেও বাস্তব এবং তাদের নিজস্ব সমাজ, জীবন ও ব্যবস্থা রয়েছে।

ইবলিস নিজেও জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
(সূরা আল-কাহফ : ৫০)

অর্থ: “সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত; অতঃপর সে তার রবের আদেশ অমান্য করল।”

তাফসীরে ইবনে কাসীর অনুযায়ী, ইবলিস বহু বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিল এবং ফেরেশতাদের সঙ্গেও অবস্থান করার মর্যাদা পেয়েছিল। কিন্তু আদম (আ.)-কে সিঁজদার নির্দেশ আসার পর তার অন্তরের লুকানো অহংকার প্রকাশ পায়। সে নিজের আগুনের সৃষ্টি হওয়াকে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ মনে করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে চিরতরে অভিশপ্ত হয়ে যায়।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ইবাদত ও জ্ঞান থাকলেও অহংকার মানুষ বা জিনকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

ইফরিত ও মারিদ জিন

জিনদের মধ্যকার শক্তিশালী ও দ্রুতগামী একটি শ্রেণিকে “ইফরিত” বলা হয়।

কুরআনে এসেছে—

قَالَ عَفْرَيْتُ مِنَ الْجِنَّ أَنَا آتِيكَ بِهِ

(সূরা আন-নামল : ৩৯)

অর্থ: “জিনদের মধ্যকার এক শক্তিশালী ইফরিত বলল, আমি (রানীর) সিংহাসনটি তোমার কাছে এনে দিতে পারি।”

তাফসীর ইবনে কাসীর অনুযায়ী, এটি জিনদের অতিদ্রুত গতি ও শক্তির একটি উদাহরণ। এখানে “ইফরিত” বলতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগামী এক ধরনের জিনকে বোঝানো হয়েছে, যে অল্প সময়ে দূরবর্তী বস্তু আনার ক্ষমতা দাবি করেছিল (আল্লাহর অনুমতিতে)।

অন্যদিকে “মারিদ” শব্দটি কুরআনে শয়তান ও বিদ্রোহী সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে—

وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

(সূরা আস-সাফফাত : ৭)

অর্থ: “এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী ও অবাধ্য শয়তান থেকে (আসমানকে) সুরক্ষিত রাখা হয়েছে।”

এখানে “মারিদ” বলতে এমন শয়তানকে বোঝানো হয়েছে, যে অত্যন্ত অবাধ্য, অহংকারী এবং আল্লাহর সীমা লঙ্ঘনকারী।

জিনদের বিভিন্ন রূপ ও চলাফেরা

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

الْجِنُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ

(মুসতাদরাক হাকিম)

অর্থ: জিন তিন প্রকার—

১. এক প্রকার উড়ে বেড়ায়।
২. এক প্রকার সাপ ও কুকুরের রূপ ধারণ করে।
৩. এক প্রকার বিভিন্ন স্থানে চলাফেরা করে।

সাহাবির ঘরে সাপের ঘটনা

ঘরের মধ্যে সাপ দেখা ও সেটিকে হত্যা করার পরিণতি সম্পর্কে সহীহ হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা জিন ও অদৃশ্য জগত সম্পর্কে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক সাহাবি (রাযি.) তাঁর ঘরের ভেতর একটি সাপ দেখতে পান। ঘরের নিরাপত্তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী তিনি সেটিকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলেন। কিছু বর্ণনায় এসেছে, তিনি সেটিকে আঘাত করেন এবং পরে সেটি মারা যায়। এর পরপরই তিনি

বা তাঁর পরিবার কোনো কষ্ট বা ক্ষতির সম্মুখীন হন, এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থাপন করা হয়।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের সাপ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, ঘরের ভেতর সাপ দেখা গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা উচিত নয়; বরং আগে তাকে সতর্ক করতে হবে। কারণ কিছু সাপ আসলে সাধারণ প্রাণী নয়, বরং মুসলিম জিন যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর মানুষের ঘরে প্রবেশ করে এবং কখনো কখনো সাপের রূপ ধারণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যে, ঘরের সাপকে প্রথমে তিনবার সতর্ক করতে হবে— যাতে সে যদি প্রকৃতপক্ষে জিন হয়, তাহলে সে সেখান থেকে সরে যায়। যদি সতর্ক করার পরও সে বের না হয়, তখন তাকে হত্যা করা যাবে।

সূত্র:সহীহ মুসলিম : ২২৩৬

(বিভিন্ন সংস্করণে ২২৩৭/২২৩৮ হিসেবেও এসেছে)

হাদীসের মূল ব্যাখ্যা (ইমামদের আলোকে)

ইমাম নববী (রহ.) এর ব্যাখ্যা:

তিনি বলেন, এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে কিছু জিন আল্লাহর ইচ্ছায় সাপের রূপ ধারণ করতে পারে। বিশেষ করে মদিনায় কিছু জিন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা ঘরের ভেতর অবস্থান করত।

ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গি:

আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন, এই বিধান মূলত দুই উদ্দেশ্যে এসেছে—

নির্দোষ প্রাণী বা জিনকে অযথা ক্ষতি থেকে রক্ষা করা

অদৃশ্য জগত সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত ভুল সিদ্ধান্ত এড়ানো।

জিন জাতির একটি অংশ শয়তান হিসেবে পরিচিত, তবে সব জিন শয়তান নয়। কিছু জিন মুসলিমও হতে পারে—যেমন ঘরের সাপের হাদীসে উল্লেখ আছে।

তাফসীর গ্রন্থের আলোকে জিনদের প্রকৃতি

জিনদের প্রকৃতি সম্পর্কে তাফসীর ও হাদীস থেকে জানা যায়, তারা দ্রুত চলাচল করতে পারে, বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে সক্ষম এবং মানুষের অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করতে পারে। তবে তাদের কোনো ক্ষমতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কার্যকর হয় না।

তারা মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে। তবে তারা মানুষকে বাধ্য করতে পারে না; কেবল প্ররোচনা দিতে পারে।

জিন ও শয়তানের জগৎ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, জিনদের প্রভাব মূলত মানুষের দুর্বলতা, গাফিলতি এবং আধ্যাত্মিক দুর্বলতার উপর নির্ভর করে। তারা চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখে না, বরং শুধুমাত্র ফিসফিস ও প্রলোভনের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে।

শয়তানের চক্রান্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, শয়তান মানুষের জন্য ধাপে ধাপে ফাঁদ তৈরি করে—প্রথমে ছোট গাফিলতি, তারপর ছোট গুনাহ, এরপর বড় গুনাহ—এভাবে ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তি-এ উল্লেখ করা হয়েছে, জিন ও শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার মূল উপায় হলো সালাত, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক ও নাস এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল।

তাফসীর ও হাদীসের আলোকে আরও জানা যায়, কিছু জিন কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা বলেছিল—

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

(সূরা আল-জিন : ১)

অর্থ: “নিশ্চয়ই আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।”

এই ঘটনা প্রমাণ করে, জিনরাও সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং আল্লাহর বাণী তাদের অন্তরেও প্রভাব ফেলতে পারে।

জিন সৃষ্টির পেছনের হাকীকত (বাস্তবতা) বোঝার জন্য কুরআন, সহীহ হাদীস এবং তাফসীরের আলোচনাকে একসাথে দেখলে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়—জিন শুধু একটি “অদৃশ্য সৃষ্টি” নয়, বরং আল্লাহর একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টি, যার মাধ্যমে পরীক্ষা, ইবাদত এবং গায়েবের প্রতি ঈমানের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬)

অর্থ: “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।”

এই আয়াত জিন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দেয়—ইবাদত। তাফসীরবিদগণ ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে “ইবাদত” শুধু নামাজ-রোজা নয়; বরং আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ মানা এবং গায়েবের প্রতি ঈমান রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীরে ইবনে কাসীরসহ অন্যান্য তাফসীরে এসেছে, আল্লাহ জিন সৃষ্টি করেছেন যেন তাদের মধ্যে থেকে কিছু বান্দা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর আনুগত্য করে এবং কিছু অবাধ্য হয়ে শাস্তির উপযুক্ত হয়—এটাই পরীক্ষার জগতের বাস্তবতা।

৫.জিন সৃষ্টির হাকীকত

পরীক্ষার এক জগত

তাফসীরবিদদের মতে, জিন সৃষ্টি করা হয়েছে তিনটি প্রধান হিকমতের জন্য—

প্রথমত, আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশের জন্য—তিনি এমন সৃষ্টি করেছেন যা মানুষ দেখতে পায় না, কিন্তু বাস্তব।

দ্বিতীয়ত, গায়েবের প্রতি ঈমানকে পরীক্ষা করার জন্য—মানুষ শুধু দৃশ্যমান জিনিসেই বিশ্বাস করে না, বরং অদৃশ্য জগতেও বিশ্বাস স্থাপন করে।

তৃতীয়ত, ইবাদতের পরিসর বাড়ানোর জন্য—জিনও আল্লাহর বান্দা, তাদের জন্যও হেদায়েত ও গোমরাহির পথ খোলা।

এই বিষয়টি জিন ও শয়তানের জগৎ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে—জিনদের জগত মানুষের জগতের সমান্তরাল হলেও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়; বরং সম্পূর্ণভাবে তাঁর হুকুমাম্বীন।

ইবলিস ছিল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন—

كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
(সূরা আল-কাহফ : ৫০)

অর্থ: “সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত; অতঃপর সে তার রবের আদেশ অমান্য করল।”

তাফসীরে ইবনে কাসীর অনুযায়ী, ইবলিস বহু বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিল, এমনকি তাকে ফেরেশতাদের সাথেও রাখা হয়েছিল তার ইবাদতের কারণে। কিন্তু আদম (আ.)-কে সিজদার নির্দেশ আসার পর তার অন্তরের লুকানো অহংকার প্রকাশ পায়। সে নিজের আগুনের সৃষ্টি হওয়াকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মনে করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে।

এখান থেকেই তাফসীরবিদরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা বলেন—জ্ঞান, ইবাদত বা মর্যাদা কখনোই মানুষকে রক্ষা করে না, যদি তার অন্তরে অহংকার থাকে।

জিনদের প্রকৃতি ও মানুষের সাথে সম্পর্ক

তাফসীর ও হাদীসের আলোকে জানা যায়, জিনরা—

- মানুষের মতো বুদ্ধিসম্পন্ন
- ঈমান ও কুফর গ্রহণ করে
- বিবাহ ও প্রজনন করে
- মৃত্যুবরণ করে

আল্লাহ বলেন—

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ
(সূরা আল-জিন : ১১)

অর্থ: “আমাদের মধ্যে কিছু নেককার আছে এবং কিছু তার বিপরীত।”

তারা মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু কোনো জোর বা ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শুধু প্ররোচনা দিতে পারে। শয়তানের চক্রান্ত গ্রহণে বলা হয়েছে, শয়তান মানুষের অন্তরে সরাসরি জোর খাটায় না; বরং ধীরে ধীরে গাফিলতি, সন্দেহ ও প্রলোভনের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

প্রসিদ্ধ ঘটনা: জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণ

তাফসীরবিদদের বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তখন কিছু জিন তা শুনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

তারা ফিরে গিয়ে তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল—

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

(সূরা আল-জিন : ১)

অর্থ: “নিশ্চয়ই আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।”

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সত্য যখন স্পষ্টভাবে পৌঁছে যায়, তখন জিনরাও তা গ্রহণ করতে পারে। এটি জিনদের বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রমাণ।

তাকসীরের আলোকে জিন সৃষ্টির মূল হাকীকত হলো—

- তারা আল্লাহর বান্দা এবং পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি।
- তাদের উপাদান আগুন হলেও তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়।
- তাদের অস্তিত্ব গায়েবের প্রতি ঈমানের অংশ।
- তারা মানুষের শত্রু বা বন্ধু হতে পারে তাদের ঈমান অনুযায়ী।
- তাদের প্রভাব সীমিত, আল্লাহর অনুমতির বাইরে কিছুই নয়।

এই বাস্তবতা বুঝতে পারলে জিন জগত নিয়ে অযথা ভয় নয়, বরং সচেতনতা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

সার্বিকভাবে, জিন জাতির সৃষ্টি একটি হিকমতপূর্ণ বাস্তবতা। তারা আল্লাহর বান্দা, পরীক্ষার অধীন, এবং মানুষের মতোই ঈমান ও আমলের জন্য দায়ী। তাদের অস্তিত্ব আমাদের শেখায়—দৃশ্যমান জগতের পাশাপাশি একটি অদৃশ্য জগতও আছে, যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

৬.আদম (আ.) ও ইবলিসের ঘটনা

মানব ইতিহাসের সূচনালগ্নেই যে মহান ও শিক্ষণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা হলো আদম (আ.)-এর সৃষ্টি এবং তার প্রতি ইবলিসের অহংকারজনিত অবাধ্যতা। এই ঘটনা কেবল একটি অতীত কাহিনী নয়; বরং মানবজাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসের প্রথম পাঠ—যেখানে স্পষ্ট হয়ে যায় আনুগত্য ও অহংকারের দ্বন্দ্ব, সত্য ও বিদ্রোহের সংঘাত, এবং হেদায়েত ও গোমরাহির সূচনা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
(সূরা আল-বাকার : ৩৪)

অর্থ:“আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।”

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ইবলিসের পতনের মূল কারণ ছিল কোনো ভুল বোঝাবুঝি নয়; বরং সচেতন অহংকার এবং আল্লাহর স্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

আল্লাহ আরও বলেন—

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
(সূরা আল-আ'রাফ : ১২)

অর্থ:“আমি তার চেয়ে উত্তম; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।”

তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যায়, এটি ছিল প্রথম “তুলনামূলক অহংকার”—যেখানে ইবলিস সৃষ্টির উপাদানকে ভিত্তি করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল। অথচ তাফসীরে ইবনে কাসীরসহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ স্পষ্ট করেছেন, এখানে মূল সমস্যা ছিল যুক্তি নয়,

বরং অন্তরের অহংকার যা সত্যকে গ্রহণ করতে দেয়নি। তাফসীরের বর্ণনায় জানা যায়, ইবলিস দীর্ঘ সময় আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত ছিল এবং ফেরেশতাদের সাথেও অবস্থান করত। কিন্তু আদম (আ.)-কে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ আসার পর তার অন্তরের গোপন অহংকার প্রকাশ পায়। সে আল্লাহর আদেশকে নিজের যুক্তির নিচে ফেলতে চায় এবং এর মাধ্যমেই তার পতনের সূচনা ঘটে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ
(সহীহ মুসলিম)

অর্থ: “অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।”

এই হাদীস ইবলিসের চরিত্রকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে—সে সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং আদম (আ.)-কে অবজ্ঞা করেছে।

ইবলিসের শপথ ও মানবজাতির বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী চক্রান্ত

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ
(সূরা আল-আ'রাফ : ১৬)

অর্থ: “সে বলল, আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব।”

এই ঘোষণার মাধ্যমে ইবলিস মানবজাতির বিরুদ্ধে একটি চিরস্থায়ী মানসিক যুদ্ধ শুরু করে। তাফসীরবিদদের মতে, এটি সরাসরি যুদ্ধ নয়; বরং ধাপে ধাপে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কৌশল—যেখানে সন্দেহ, প্রলোভন এবং গাফিলতির মাধ্যমে মানুষকে সত্য পথ থেকে দূরে সরানো হয়।

“শয়তানের চক্রান্ত” গ্রন্থে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শয়তানের কৌশল কখনো সরাসরি আক্রমণ নয়; বরং সে মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির ভেতরে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে, যাতে মানুষ নিজেই নিজের ক্ষতির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

আদম (আ.)-এর জান্নাতের জীবন ও শয়তানের প্রথম ওয়াসওয়াসা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ
(সূরা তা-হা : ১২০)

অর্থ: “তখন শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল।”

তাফসীর অনুযায়ী, শয়তান আদম (আ.)-কে সরাসরি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আকৃষ্ট করে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়—যেমন চিরস্থায়ী জীবন ও উন্নত মর্যাদা লাভের ধারণা। এটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম “ওয়াসওয়াসা”—একটি সূক্ষ্ম মানসিক প্ররোচনা, যা সত্যকে আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করে।

জিন ও শয়তানের জগৎ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ওয়াসওয়াসা হলো শয়তানের প্রধান অস্ত্র; এটি মানুষের চিন্তার ভেতরে প্রবেশ করে সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা ধোঁয়াটে করে দেয়।

ভুল, অনুতাপ ও মানবজাতির জন্য তাওবার দরজা

আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের প্রলোভনে সাময়িক ভুল করেন। তবে তারা সাথে সাথেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

(সূরা আল-বাকার : ৩৭)

অর্থ: “অতঃপর আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু শব্দ গ্রহণ করল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন।”

তাফসীরবিদদের মতে, এই ঘটনা মানবজাতির জন্য এক চিরন্তন বার্তা—ভুল করা ধ্বংস নয়, বরং ভুলের পর গর্ব করে না ফেরা ধ্বংসের কারণ।

শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তি গ্রহণে বলা হয়েছে, শয়তানের সবচেয়ে বড় সাফল্য তখনই ঘটে, যখন মানুষ গুনাহের পর তাওবা থেকে দূরে সরে যায় এবং হতাশায় ডুবে যায়।

ঘটনার গভীর শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ

তাফসীর ও হাদীসের আলোকে এই ঘটনার মূল শিক্ষা অত্যন্ত গভীর—

- অহংকারই শয়তানের প্রথম ও প্রধান অপরাধ।
- আল্লাহর নির্দেশের সামনে ব্যক্তিগত যুক্তির কোনো মূল্য নেই।
- শয়তান মানবজাতির চিরস্থায়ী ও প্রকাশ্য শত্রু।
- ওয়াসওয়াসা তার প্রধান ও সূক্ষ্ম অস্ত্র।
- তাওবা হলো মানুষের জন্য মুক্তির দরজা।

আদম (আ.)-এর ঘটনা শয়তানের প্রথম চক্রান্তের সূচনা। সেখানেই সে মানুষের শত্রু হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে মানবজাতিকে বিভ্রান্ত করার পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনার ধারাবাহিক বাস্তবায়ন আমরা পরবর্তীতে মানব ইতিহাসে দেখতে পাই। সেই ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো আরবের মূর্তিপূজার সূচনা, যেখানে শয়তান ধীরে ধীরে মানুষের আকীদাকে তাওহীদ থেকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

আরবে মূর্তিপূজার সূচনা ও শয়তানের চক্রান্ত (সীরাতের আলোকে)

আরব উপদ্বীপে প্রথমদিকে মানুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তাওহীদের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাবাঘর ছিল এক আল্লাহর ইবাদতের কেন্দ্র। কিন্তু সময়ের প্রবাহে শয়তান ধীরে ধীরে মানুষের আকীদা বিকৃত করতে শুরু করে এবং মূর্তিপূজার সূচনা ঘটে।

সীরাত ও ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ‘আমর ইবন লুহাই আল-খুযাঈ’ ছিল আরবে প্রকাশ্য মূর্তিপূজার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক। সে শাম (সিরিয়া) সফরে গিয়ে সেখানে মানুষকে মূর্তির পূজা করতে দেখে। তাদেরকে সে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে—এগুলো তাদের উপকার করে, বৃষ্টি আনে এবং বিপদ দূর করে। এতে প্রভাবিত হয়ে ‘আমর ইবন লুহাই’ একটি মূর্তি আরবে নিয়ে আসে এবং কাবার পাশে স্থাপন করে। এরপর ধীরে ধীরে আরবের বিভিন্ন গোত্র মূর্তিপূজায় জড়িয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

“আমি ‘আমর ইবন লুহাই’কে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম আরবদের মাঝে মূর্তিপূজার প্রচলন করেছিল।”

- সহীহ বুখারী : ৩৫২১

- সহীহ মুসলিম : ২৮৫৬

ইমাম ইবনে কাসীর ও সীরাতবিদগণ উল্লেখ করেন, শয়তান মানুষের অন্তরে ধীরে ধীরে শিরকের বীজ বপন করেছিল। প্রথমে নেককার লোকদের স্মরণ করার জন্য প্রতীক বানানো হয়, পরে তা সম্মান থেকে ইবাদতে রূপ নেয়। এভাবেই শয়তান তাওহীদের সমাজকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

কুরআনেও আল্লাহ তাআলা শয়তানের এই প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন—

“হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে।”
(সূরা আল-আ'রাফ : ২৭)

তাফসীরবিদদের মতে, শয়তানের অন্যতম বড় কৌশল হলো—গুনাহ ও শিরককে ধীরে ধীরে মানুষের কাছে সুন্দর করে তুলে ধরা।

শিক্ষা

-শিরক একদিনে শুরু হয়নি; ধীরে ধীরে ছড়িয়েছে।

-শয়তান প্রথমে “সম্মান” থেকে মানুষকে “ইবাদত”-এর দিকে নিয়ে যায়।

-তাওহীদ থেকে বিচ্যুতির মূল কারণ ছিল অজ্ঞতা ও শয়তানের ধোঁকা।

-ইসলামে আকীদা রক্ষায় কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা অত্যন্ত জরুরি।

আদম (আ.)-এর ঘটনা থেকে শুরু করে আরবের মূর্তিপূজার সূচনা পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, শয়তানের চক্রান্ত কখনো একসাথে প্রকাশ পায় না; বরং তা ধাপে ধাপে, কৌশলে এবং মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বিস্তার লাভ করে। আদম (আ.)-এর সময় তার প্রথম লক্ষ্য ছিল মানবজাতিকে জান্নাত থেকে বিচ্যুত করা, আর পরবর্তী সময়ে সেই একই চক্রান্ত মানব সমাজে শিরক ও বিভ্রান্তির রূপে বিস্তৃত হয়েছে।

আরবের মূর্তিপূজার ইতিহাস আমাদের শেখায়—শয়তান কখনো সরাসরি শিরকের দিকে ডাকে না; বরং ধীরে ধীরে সম্মান, আবেগ ও কুসংস্কারের মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত করে। তাই এই দুই ঘটনা একসাথে আমাদের একটি গভীর শিক্ষা দেয়—তাওহীদ থেকে সামান্য বিচ্যুতি শেষ পর্যন্ত বড় বিভ্রান্তি ও শিরকের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৭.সীরাতের আলোকে শয়তানের চক্রান্ত

মানবজীবনের ইতিহাসে শয়তান একটি অদৃশ্য কিন্তু বাস্তব শত্রু, যে মানুষের ঈমান নষ্ট করা ও আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য সর্বদা চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, নবুওয়াতের শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে শয়তানের চক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে—কখনো গুজব, কখনো বিভ্রান্তি, আবার কখনো ভয় ও অহংকারের মাধ্যমে।

এই অধ্যায়ে সীরাতের আলোকে শয়তানের কৌশল ও তার প্রভাব সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করব, ইন শা আল্লাহ।

বদর যুদ্ধে শয়তানের ভূমিকা

বদর যুদ্ধের আগে কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন ইবলিস মানুষের রূপে কুরাইশদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে তাদের সাহস বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে মুসলমানদের উপর তারা সহজেই বিজয়ী হবে।

সে তাদের মধ্যে অহংকার ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে দেয়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুহূর্তে আল্লাহ ফেরেশতাদের অবতরণ ঘটান। তখন শয়তান বাস্তব পরিস্থিতি দেখে পিছিয়ে যায় এবং কুরাইশদের ছেড়ে পালিয়ে যায়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ۖ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفَتَنَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ

(সূরা আল-আনফাল : ৪৮)

অর্থ: “যখন শয়তান তাদের কাজকে তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হবে না... কিন্তু যখন দুই দল মুখোমুখি হলো সে পিছিয়ে গেল।”

উল্লেখ যুদ্ধে বিভ্রান্তি ও গুজব

উল্লেখ যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলমানরা বিজয়ী হচ্ছিলেন। কিন্তু কিছু সাহাবার অবস্থান পরিবর্তনের কারণে পরিস্থিতি বদলে যায়। এই সুযোগে শয়তান মানুষের মধ্যে ভয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

সে মানুষের অন্তরে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেয় যে রাসূলুল্লাহ ﷺ শহীদ হয়েছেন। এই গুজব ছড়িয়ে পড়লে অনেক সাহাবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধের শৃঙ্খলা ভেঙে যায়।

এই ঘটনার পটভূমিতে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ
(সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

অর্থ:” মুহাম্মদ তো একজন রাসূল মাত্র... যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে?”

হুনাইন যুদ্ধ: আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষা

হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল। এই সংখ্যার কারণে কিছু মানুষের মনে আত্মনির্ভরতার ভাব তৈরি হয়। শয়তান এই সুযোগে অহংকার ও গাফিলতি সৃষ্টি করে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُوزُكُمْ ۚ
(সূরা আত-তাওবা : ২৫)

অর্থ: “আল্লাহ বহু স্থানে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের দিন যখন তোমরা সংখ্যার কারণে গর্বিত হয়েছিলে...”

হিজরতের সময় ষড়যন্ত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। বিভিন্ন গোত্রের যুবকদের একত্র করে একসাথে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ
(সূরা আল-আনফাল : ৩০)

অর্থ: “যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল...”

নামাজে ওয়াসওয়াসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শয়তান নামাজের সময় মানুষের মনে বিভিন্ন চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যাতে সে মনোযোগ হারায়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন,

الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۚ
(সূরা আন-নাস : ৫)

অর্থ: যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।

এই ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে শয়তান কখনো সরাসরি যুদ্ধ করে না; বরং সে মানুষের অন্তর, চিন্তা, ভয় ও অহংকারকে ব্যবহার করে ফিতনা সৃষ্টি করে। বদর, উহুদ, হুনাইন ও হিজরতের ঘটনা প্রমাণ করে—ঈমান দৃঢ় থাকলে শয়তানের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়, আর গাফেল হলে সে সামান্য সুযোগ থেকেই বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

৮. ওয়াসওয়াসার বাস্তবতা: ইবাদত, পবিত্রতা ও হতাশার সূক্ষ্ম ফাঁদ

ওয়াসওয়াসা এমন এক সূক্ষ্ম, অদৃশ্য এবং অত্যন্ত দ্রুত প্রবেশকারী মানসিক প্রভাব, যা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং ইবাদতের গভীরতায় প্রভাব ফেলে। এটি শয়তানের অন্যতম প্রধান কৌশল, যার মাধ্যমে সে মানুষের অন্তরে সন্দেহ, অস্থিরতা, বিভ্রান্তি এবং মনোযোগহীনতা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে সালাত, অযু, তিলাওয়াত ও দোয়ার মুহূর্তে এই প্রভাব আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

(সূরা আন-নাস: ৪)

অর্থ: “আমি আশ্রয় চাই সেই কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে বারবার আসে এবং লুকিয়ে যায়।”

তাফসীরবিদদের মতে, “খান্নাস” এমন শয়তানকে বোঝায় যে মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করলে পিছু হটে, আর গাফিল হলে আবার আক্রমণ করে।

ইবাদতের সময় ওয়াসওয়াসা

সালাতে দাঁড়ানোর পর হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় চিন্তা এসে পড়ে—কখনো ভবিষ্যৎ, কখনো অতীত, কখনো পারিবারিক বা দুনিয়াবি বিষয়। অযু বা পবিত্রতা নিয়েও অতিরিক্ত সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ

(সহীহ বুখারী: ৩২৭৬, সহীহ মুসলিম: ৩৮৯)

অর্থ: “শয়তান তোমাদের কারো সালাতে এসে এমন বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয় যা সে আগে মনে করেনি।”

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, সালাতে মনোযোগ বিচ্যুতি একটি স্বীকৃত আধ্যাত্মিক বাস্তবতা, যা মানুষের ঈমানহীনতার প্রমাণ নয় বরং একটি পরীক্ষা।

প্রসিদ্ধ ঘটনা: সালাতে ওয়াসওয়াসার অভিযোগ

সাহাবী উসমান ইবন আবি আল-আস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে অভিযোগ করেন—

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ

(সহীহ মুসলিম: ২২০৩)

অর্থ: “হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার সালাত ও কীরাতের মাঝে বাধা সৃষ্টি করে এবং তা আমার জন্য বিভ্রান্তিকর করে তোলে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—

ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَنَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَانْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا

(সহীহ মুসলিম: ২২০৩)

অর্থ: “এটি একটি শয়তান, যার নাম খিনযাব। যখন তুমি তাকে অনুভব করবে, তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও এবং বাম দিকে তিনবার হালকা থুথু ফেলো।”

তাফসীর ও ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে, এই নির্দেশনা প্রমাণ করে যে ওয়াসওয়াসা একটি বাস্তব প্রভাব, কিন্তু এর প্রতিকারও শরীয়তে নির্ধারিত।

প্রসিদ্ধ ঘটনা: সন্দেহের অভিযোগ

আরেক হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলেন—

সে অযুর পর মনে করে অযু ভেঙে গেছে, যদিও কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
(সহীহ বুখারী: ১৩৭, সহীহ মুসলিম: ৩৬১)

অর্থ: “যতক্ষণ না সে শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়, ততক্ষণ সে অযু ভেঙেছে বলে মনে করবে না।”

এই হাদীস ইসলামের একটি মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠা করে—

“নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা ভঙ্গ হয় না।

পবিত্রতা (তাহরাত) নিয়ে ওয়াসওয়াসা

শয়তান মানুষের ইবাদতের সহজতাকে কঠিন করে তুলতে চায়। সে মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে—

“অযু ঠিক হলো কি না?”, “পানি পৌঁছাল কি না?”, “গোসল পূর্ণ হলো কি না?”

আল্লাহ বলেন—

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
(সূরা আল-বাকার: ১৮৫)

অর্থ: “আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠিনতা চান না।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

(সহীহ বুখারী: ৩৯)

অর্থ: “নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ।”

তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শয়তানের একটি প্রধান কৌশল হলো দ্বীনকে মানুষের কাছে কঠিন করে উপস্থাপন করা।

পবিত্রতা নিয়ে বাস্তব নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন—

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَسْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

(সহীহ মুসলিম: ৩৬২)

এই নির্দেশনা সন্দেহকে উপেক্ষা করার স্পষ্ট শিক্ষা দেয়।

হতাশা: শয়তানের দ্বিতীয় বড় অস্ত্র

ওয়াসওয়াসার আরেকটি বড় দিক হলো হতাশা সৃষ্টি করা। শয়তান মানুষকে বলে—

“তোমার ইবাদত কবুল হবে না”, “তুমি অনেক গুনাহগার”, “তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না।”

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

(সূরা আয-যুমার: ৫৩)

অর্থ: “আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না।”

আরও বলেন—

إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
(সূরা ইউসুফ: ৮৭)

অর্থ: “আল্লাহর রহমত থেকে কেবল কাফিররাই নিরাশ হয়।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ
(তিরমিজি: ২৪৯৯)

অর্থ: “প্রত্যেক মানুষই ভুল করে, আর উত্তম ভুলকারী হলো তাওবাকারীরা।”

প্রসিদ্ধ গ্রন্থমতে,

ইবনুল জাওয়ী (রহ.) তাঁর “তালবীস ইবলিস” গ্রন্থে বলেন, শয়তানের সবচেয়ে কার্যকর
অস্ত্র হলো—

-অহংকার সৃষ্টি

-অতিরিক্ত সন্দেহ

-এবং হতাশা সৃষ্টি

উমার সুলাইমান আল-আশকার তাঁর “জিন ও শয়তানের জগৎ” গ্রন্থে উল্লেখ করেন,
শয়তান মানুষের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষমতা রাখে না; সে কেবল প্ররোচনা ও
ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে প্রভাব ফেলে।

“শয়তানের চক্রান্ত” ও “শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তি” গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে—শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে ছোট গাফিলতি থেকে বড় গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, এরপর তাওবা থেকে নিরাশ করে।

বাস্তব শিক্ষা

ওয়াসওয়াসা কোনো শক্তি নয়, বরং একটি মানসিক প্ররোচনা। ইসলাম এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিকার দিয়েছে—

- নিশ্চিততার উপর আমল করা।
- সন্দেহকে গুরুত্ব না দেওয়া।
- ইবাদত সহজভাবে গ্রহণ করা।
- আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।
- কুরআন ও যিকির বৃদ্ধি করা।
- তাওবা থেকে কখনো নিরাশ না হওয়া।

ওয়াসওয়াসা মানুষের ইবাদত ভাঙার জন্য শয়তানের সবচেয়ে সূক্ষ্ম অস্ত্র। এটি সন্দেহ, অতিরিক্ততা এবং হতাশার মাধ্যমে কাজ করে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো—নিশ্চয়তা, সহজতা এবং আল্লাহর অসীম রহমতই এর চূড়ান্ত প্রতিকার।

যে ব্যক্তি এই নীতিগুলো বুঝে আমল করবে, তার জীবনে ওয়াসওয়াসা কেবল একটি দুর্বল ফিসফিস হয়ে থাকবে, যার কোনো বাস্তব শক্তি নেই।

৯.মানুষের অন্তরে শয়তানের প্রবেশপথ

মানুষের জীবনে পরিবর্তন সবসময় বড় কোনো ঘটনার মাধ্যমে আসে না; বরং খুব সাধারণ কিছু মুহূর্ত ধীরে ধীরে পুরো দিক পরিবর্তন করে দেয়। এমনই এক সাধারণ মুহূর্ত ছিল একজন তরুণের জীবনে—রাতে ঘুমানোর আগে মোবাইল হাতে নেওয়া। উদ্দেশ্য ছিল মাত্র কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়া, কিন্তু সেই “মাত্র কিছু সময়” ধীরে ধীরে এক ঘণ্টা, তারপর আরও বেশি সময় হয়ে যায়। এরপর ঘুম দেরি হয়, ফজর মিস হয়, আর অন্তরের প্রশান্তি কমে আসে।

এই নীরব পরিবর্তনের পেছনে যে শক্তি কাজ করে, কুরআন তাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
(সূরা ফাতির : ৬)

অর্থ: “নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো।”

এই শত্রুতা সরাসরি আঘাত নয়; বরং ধাপে ধাপে অজান্তে ভেতরে প্রবেশ করা। আল্লাহ তাআলা আরও সতর্ক করেছেন—

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
(সূরা আন-নূর : ২১)

অর্থ: “তোমরা শয়তানের পদক্ষেপ অনুসরণ করো না।”

তাফসীরে ইবনে কাসীর অনুযায়ী, “খুতুওয়াত” মানে হলো ছোট ছোট পদক্ষেপ—যা শুরুতে ক্ষতিকর মনে হয় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

শয়তানের প্রবেশপথগুলো

শয়তান কখনো একসাথে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে না; বরং তার প্রবেশের আলাদা আলাদা দরজা থাকে। এই দরজাগুলো মানুষ নিজের জীবনেই খুলে দেয়—কখনো অজান্তে, কখনো অভ্যাসে।

অহংকারের দরজা

মানুষ যখন নিজের জ্ঞান, অবস্থান বা অর্জনকে বড় মনে করে, তখন সে ধীরে ধীরে অন্তরের রোগে আক্রান্ত হয়। এটাই ছিল ইবলিসের প্রথম পতনের কারণ।

আল্লাহ বলেন—

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

(সূরা আল-আ'রাফ : ১২)

অর্থ: “আমি তার চেয়ে উত্তম।”

তাফসীরে ইবনে কাসীর ব্যাখ্যা করেন, এটি ছিল যুক্তি নয়—বরং অহংকার যা সত্যকে অন্ধ করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

(সহীহ মুসলিম : ৯১)

অর্থ: “অহংকার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।”

লোভের দরজা

আল্লাহ বলেন—

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
(সূরা আল-ফজর : ২০)

অর্থ: “তোমরা সম্পদকে অত্যধিক ভালোবাস।”

তাফসীর অনুযায়ী, এই অতিরিক্ত ভালোবাসা মানুষকে ধীরে ধীরে অস্থির করে তোলে। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত টান মানুষকে আখিরাত ভুলিয়ে দেয়।

বর্তমান সময়ে এটি আরও স্পষ্ট—অতিরিক্ত অর্থের দৌড়, দ্রুত সফল হওয়ার প্রতিযোগিতা, এবং সীমাহীন চাহিদা অনেক সময় মানুষকে নিজের ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

হতাশার দরজা

আল্লাহ বলেন—

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
(সূরা আয-যুমার : ৫৩)

অর্থ: “আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না।”

আরও বলেন—

إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
(সূরা ইউসুফ : ৮৭)

অর্থ: “আল্লাহর রহমত থেকে কেবল কাফিররা হতাশ হয়।”

তাফসীর অনুযায়ী, শয়তান গুনাহ করানোর পর সবচেয়ে বড় কাজ করে মানুষকে হতাশ করা—যাতে সে তাওবা থেকে দূরে সরে যায়।

একটি ঘটনা তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে—এক ব্যক্তি বারবার গুনাহ করে ভাবল, তার আর ক্ষমা নেই। সে ইবাদত ছেড়ে দিল। পরে একজন আলেম তাকে বুঝালেন, আল্লাহর দরজা কখনো বন্ধ হয় না। সে আবার ফিরে আসে।

এই ঘটনা শিক্ষা দেয়—গুনাহ নয়, হতাশাই মানুষকে ধ্বংস করে।

একাকীত্বের দরজা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ

(তিরমিজি : ২১৬৫)

অর্থ: “শয়তান একাকী ব্যক্তির সাথে থাকে।”

তাফসীরবিদরা বলেন, এটি শুধু শারীরিক একাকীত্ব নয়; বরং এমন মানসিক বিচ্ছিন্নতা যেখানে মানুষ সঠিক সঙ্গ ও পরামর্শ থেকে দূরে থাকে।

আজকের বাস্তবতায় এটি আরও গভীর—সোশ্যাল মিডিয়ার ভিড়ের মাঝেও মানুষ মানসিকভাবে একা, আর এই শূন্যতায় শয়তানের ওসওয়াসা আরও শক্তিশালী হয়।

অশ্লীলতার দরজা

আল্লাহ বলেন—

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ

(সূরা আল-আন‘আম : ১৫১)

অর্থ: “তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না।”

তাফসীর অনুযায়ী, “কাছেও যেও না” বলার কারণ হলো এটি ধীরে ধীরে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়।

“শয়তানের চক্রান্ত” গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শয়তান প্রথমে দৃষ্টি, তারপর চিন্তা, তারপর অভ্যাস তৈরি করে মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে মোবাইল, শর্ট ভিডিও, এবং অনিয়ন্ত্রিত কনটেন্ট এই দরজাকে আরও সহজ করে দিয়েছে। একজন তরুণ রাতের শুরুতে মোবাইল হাতে নেয়। প্রথমে কিছু ভিডিও দেখে। এরপর আরও কিছু কনটেন্ট আসে। সময় চলে যায়। ঘুম দেরি হয়। ফজর মিস হয়। পরের দিন ক্লান্তি, মনোযোগহীনতা, ইবাদতে অনীহা—এভাবে ধীরে ধীরে জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়।

এটাই কুরআনের ভাষায় “খুতুওয়াতুশ শয়তান”—ধাপে ধাপে পতনের পথ।

প্রতিকার

কুরআন ও হাদীস এই পথ থেকে বাঁচার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে—

-আল্লাহর স্মরণ বৃদ্ধি করা।

(সূরা রাদ : ২৮)

-সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

(সূরা আনকাবুত : ৪৫)

-সন্দেহ ও গাফিলতিকে গুরুত্ব না দেওয়া।

(সহীহ বুখারী : ১৩৭)

-সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা।

(সহীহ বুখারী : ৬৬৭৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَّسَ الشَّيْطَانُ
(সহীহ বুখারী : ৫০৮৭)

অর্থ: “যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে, শয়তান পিছিয়ে যায়।”

শয়তান মানুষের জীবনে কখনো হঠাৎ প্রবেশ করে না। সে ধীরে ধীরে প্রবেশপথ তৈরি করে—অহংকার, লোভ, হতাশা, একাকীত্ব, অশ্লীলতা এবং গাফিলতির মাধ্যমে।

যে ব্যক্তি এই দরজাগুলো চিনে রাখে, তার জীবন কখনো পুরোপুরি শয়তানের নিয়ন্ত্রণে যায় না; বরং প্রতিটি ফিসফিস তার কাছে শুধু একটি দুর্বল প্রলোভন হয়ে থাকে—যা সে ইচ্ছা করলেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

১০. শয়তানের কৌশল ও প্রতারণা

কুরআন ও তাফসীরের আলোকে শয়তানের কৌশলকে কয়েকটি মূল ধারায় বোঝা যায়।

প্রথম কৌশল হলো সত্যকে বিকৃত করা এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
(সূরা আল-হিজর : ৩৯)

অর্থ: “আমি তাদের জন্য পৃথিবীতে (পাপকে) সুন্দর করে দেখাব।”

তাফসীরবিদরা বলেন, এই “তায়য়ীন” বা সুন্দর দেখানোই শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র—সে পাপকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং নেক আমলকে কঠিন মনে করায়।

দ্বিতীয় কৌশল হলো ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

(সূরা আন-নাস : ৪)

অর্থ: “আমি আশ্রয় চাই সেই কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে বারবার আসে এবং লুকিয়ে যায় (অর্থাৎ শয়তান)।”

ইবনে কাসীরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, শয়তান অন্তরে আসে, চিন্তা সৃষ্টি করে, আবার সুযোগ বুঝে লুকিয়ে যায়। সে মানুষের দৃঢ়তা দেখে পিছিয়ে যায়, দুর্বলতা দেখলে আবার ফিরে আসে।

সহীহ হাদীসে এসেছে—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَذْكُرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম : ১৩২)

অর্থাৎ শয়তান মানুষকে এমন চিন্তা দেয় যা তার ইবাদত ও মনোযোগ নষ্ট করে।

তৃতীয় কৌশল হলো ধাপে ধাপে পথভ্রষ্ট করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

(সূরা আন-নূর : ২১)

অর্থ: “তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।”

তাফসীরে এসেছে, এই “খুতুওয়াত” হলো ছোট গুনাহ, ছোট অবহেলা, ছোট গাফিলতি—যা একসময় বড় পাপে রূপ নেয়।

ইমাম ইবনুল জাওয়ী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “তালবীস ইবলিস”-এ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, শয়তান মানুষকে একসাথে ধ্বংস করে না; বরং ধীরে ধীরে তার চিন্তা, অভ্যাস ও পরিবেশ পরিবর্তন করে দেয়।

চতুর্থ কৌশল হলো হতাশা সৃষ্টি করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

(সূরা আয-যুমার : ৫৩)

অর্থ: “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না।”

শয়তান মানুষের মধ্যে দুটি বিপরীত ফাঁদ তৈরি করে—গুনাহ করানো এবং তারপর সেই গুনাহকে অমার্জনীয় মনে করানো। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম ইবনে কাসীর ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ।

“শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তি” গ্রন্থে বলা হয়েছে, শয়তানের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হলো মানুষকে তাওবা থেকে দূরে রাখা।

পঞ্চম কৌশল হলো অহংকার সৃষ্টি করা।

ইবলিসের ইতিহাসই এর প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

(সূরা আল-আ'রাফ : ১২)

অর্থ: “আমি তার চেয়ে উত্তম (শ্রেষ্ঠ)।”

তাফসীর অনুযায়ী, ইবলিস নিজের সৃষ্টি উপাদান (আগুন) কে শ্রেষ্ঠ মনে করে আদম (আ.)-কে তুচ্ছ করে। এই অহংকারই তার চিরস্থায়ী পতনের কারণ হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

(সহীহ মুসলিম : ৯১)

অর্থ: “অহংকার হলো সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।”

এই ধাপে ধাপে প্রতারণা, ওয়াসওয়াসা, আত্মতুষ্টি এবং হতাশার কৌশলগুলো শুধু তাত্ত্বিক কোনো ধারণা নয়; বরং মানব ইতিহাসে বহু বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তাফসীর ও ইসলামি ইতিহাসে এমন কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে একজন ইবাদতকারী মানুষও শয়তানের সূক্ষ্ম কৌশলের শিকার হয়ে ধীরে ধীরে পতনের পথে চলে গেছে।

এই নীতির বাস্তব রূপ বোঝার জন্য একটি বহুল আলোচিত শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করা হল—বারসিসার ঘটনা। এটি এমন একটি উদাহরণ, যেখানে শয়তান একেবারে সরাসরি আক্রমণ না করে বরং ধাপে ধাপে প্রবেশপথ তৈরি করে একজন ইবাদতকারীর জীবনকে পরিবর্তন করে দেয়।

বারসিসা ও শয়তানের চূড়ান্ত প্রতারণার ঘটনা

তাফসীর ও সীরাহ-ভিত্তিক বিভিন্ন বর্ণনায় (বিশেষ করে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে কাসীরের তাফসীরের কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা আলোচনায়) বারসিসা নামক এক আবেদের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত ইবাদতকারী ব্যক্তি, যিনি দীর্ঘ সময় দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

শয়তান প্রথমে সরাসরি তাকে গুনাহে ফেলতে পারেনি। তাই সে ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করে তার কাছে প্রবেশ করে।

প্রথমে শয়তান তাকে মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেশি বেশি নির্জন ইবাদতের দিকে উৎসাহিত করে। এতে বারসিসা সাধারণ সমাজ থেকে দূরে চলে যায়।

এরপর শয়তান মানুষের আকারে এসে তার ইবাদতের প্রশংসা করতে থাকে এবং তাকে আরও নির্জনতা ও অহংকারের দিকে ঠেলে দেয়—যেন সে ভাবতে শুরু করে, “আমি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা।”

এক পর্যায়ে এক অসুস্থ নারী (তার আত্মীয় বা প্রতিবেশী হিসেবে বর্ণিত) তার কাছে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। শয়তান ধীরে ধীরে তার অন্তরে চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়—সে প্রথমে শুধু সাহায্যের সীমা লঙ্ঘন না করলেও পরে ধাপে ধাপে তাকে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।

এরপর নারীটি গর্ভবতী হয় এবং শয়তান তাকে আরও বড় অপরাধে জড়িয়ে ফেলে—শিশুটিকে হত্যা এবং পরে লাশ গোপন করার পরামর্শ দেয়।

যখন সত্য প্রকাশ পায়, সমাজের সামনে তার অপমান ঘটে। তখন শয়তান শেষ ধাপের প্রতারণা করে—সে তাকে মনে করিয়ে দেয়, “এখন তোমার আর তাওবার সুযোগ নেই।”

নিরাশ হয়ে বারসিসা ঈমান হারানোর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে বলে বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।

ঘটনার তাৎপর্য

এই ঘটনাটি সরাসরি কুরআনে উল্লেখ নেই, তবে তাফসীরবিদরা এটি “ওয়াসওয়াসা এবং ধাপে ধাপে গুনাহে পতনের” বাস্তব উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
(সূরা ফাতির : ৬)

অর্থ: “নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো।”

তাফসীর ও ইসলামি গ্রন্থের ব্যাখ্যা

ইমাম ইবনে কাসীরসহ অনেক তাফসীরবিদ উল্লেখ করেন—শয়তানের সবচেয়ে বড় কৌশল হলো:

- ছোট গাফিলতিকে বড় গুনাহে রূপান্তর করা।
- ইবাদতের মধ্যে অহংকার ঢুকিয়ে দেওয়া।
- মানুষকে “আমি ঠিক আছি” এই আত্মতুষ্টিতে রাখা।
- অপরাধের পর “তুমি শেষ” এই হতাশা সৃষ্টি করা।

“শয়তানের চক্রান্ত” এবং “জিন ও শয়তানের জগৎ” বিষয়ক আলোচনায় এই ঘটনাকে একটি মানসিক পতনের ধারাবাহিক উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়—যেখানে শয়তান একাধিক ধাপে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আধুনিক জীবনের সাথে সম্পর্ক

আধুনিক যুগে শয়তানের কৌশল নতুন রূপ নিয়েছে, কিন্তু মূল নীতি একই রয়েছে। “জিন ও শয়তানের জগৎ” গ্রন্থে উল্লেখ আছে—শয়তান মানুষের সময়, মনোযোগ ও আবেগকে লক্ষ্য করে।

আজকের বাস্তবতায় এই ঘটনার প্রতিফলন দেখা যায়—

- মোবাইল আসক্তি,
- অপ্রয়োজনীয় স্ক্রলিং,
- ইবাদতে মনোযোগহীনতা,
- অশ্লীল কনটেন্টে অভ্যস্ততা,

- রাত জাগা ও ফজর মিস করা,
- একটি ছোট গাফিলতি (নিয়ত করে ভুল কনটেন্ট দেখা, সময় নষ্ট করা),
- ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিণত হওয়া,
- তারপর ইবাদত কমে যাওয়া,
- শেষে অনুশোচনা ও হতাশা।

এই পুরো প্রক্রিয়া বারসিনার ঘটনার আধুনিক রূপ। এগুলো সরাসরি পাপ মনে না হলেও ধীরে ধীরে অন্তরকে দুর্বল করে।

শিক্ষা

- শয়তান কখনো সরাসরি মানুষকে ধ্বংস করে না।
- সে ধাপে ধাপে প্রবেশ করে।
- ইবাদতকে অহংকারে পরিণত করে।
- গুনাহকে “ছোট” বানিয়ে দেয়।
- আর শেষে হতাশার দরজা খুলে দেয়।

এক্ষেত্রে করণীয় -

প্রথম প্রতিরক্ষা হলো অন্তরের সচেতনতা তৈরি করা—নিজেকে সবসময় আল্লাহর নজরের মধ্যে আছে বলে অনুভব করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۚ

(সূরা আল-আলাক : ১৪)

অর্থ: “সে কি জানে না যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন?”

তাফসীর অনুযায়ী, এই অনুভূতি শক্তিশালী হলে গোপন গুনাহ ও শয়তানের প্ররোচনা দুর্বল হয়ে যায়। কারণ শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে “অদৃশ্যতার ধারণা” তৈরি করে—যে কেউ দেখছে না।

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা হলো অন্তরের পরিবেশ পরিবর্তন করা—শুধু বাহ্যিক সঙ্গ নয়, চিন্তার পরিবেশও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ ۖ

(সহীহ বুখারী : ২১০১)

অর্থ: “সৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো আতরের বিক্রেতার মতো।”

ইবনে কাসীরসহ মুফাসসিরদের ব্যাখ্যায় এসেছে, সৎ সঙ্গ শুধু মানুষকে ভালো কাজ শেখায় না; বরং শয়তানের প্রভাবও কমিয়ে দেয়।

তৃতীয় প্রতিরক্ষা হলো ছোট আমলকে অবহেলা না করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا

(সহীহ মুসলিম : ২৬২৬)

অর্থ: “কোনো ভালো কাজকে ছোট মনে করো না।”

তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যায় এসেছে, শয়তান চায় মানুষ ছোট নেক আমলকে তুচ্ছ মনে করুক, যাতে সে ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে। অথচ ছোট আমলই অন্তরকে শক্ত করে।

চতুর্থ প্রতিরক্ষা হলো নিয়মিত আত্মসমালোচনা (মুহাসাবা) করা।

হাদীসে এসেছে—

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ

(তিরমিজি : ২৪৫৯)

অর্থ: “বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে হিসাব করে।”

এই আত্মসমালোচনা মানুষকে শয়তানের ধোঁকা বুঝতে সাহায্য করে—সে কোথায় ধীরে ধীরে ঢুকছে, তা ধরতে পারে।

পঞ্চম প্রতিরক্ষা হলো দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

(সূরা গাফির : ৬০)

অর্থ: “তোমাদের রব বলেছেন, আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।”

শয়তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হলো এমন অন্তর, যে নিজের শক্তির উপর নয়, আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে।

ষষ্ঠ প্রতিরক্ষা হলো গাফিলতি ভাঙার অভ্যাস তৈরি করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

تُعَرِّضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ

(সহীহ মুসলিম : ১৪৪)

অর্থ: “ফিতনা হৃদয়ে উপস্থাপিত হয়।”

তাফসীর অনুযায়ী, হৃদয় যদি নিয়মিত জাগ্রত না থাকে, তবে শয়তান ধীরে ধীরে সেটিকে কঠিন করে ফেলে। তাই নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, বিশেষ করে সূরা বাকারাহ, অন্তরকে জীবিত রাখে।

শেষ উপলব্ধি

শয়তানের কৌশল কখনো সরাসরি আক্রমণ নয়; বরং ধাপে ধাপে বিভ্রান্তি, সৌন্দর্যের ছদ্মবেশ, ওয়াসওয়াসা, হতাশা এবং অহংকারের মাধ্যমে মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরানো।

তবে আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত, তাওবা এবং সচেতন জীবনই এই প্রতারণার সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।

যে ব্যক্তি শয়তানের কৌশল চিনে রাখে, তার জীবনে শয়তান শক্তি নয়—বরং দুর্বল ফিসফিসে পরিণত হয়।

১১. শয়তানের প্রভাবে সমাজে অশান্তির বাস্তবতা

মানবসমাজের শান্তি কোনো বাহ্যিক কাঠামোর উপর একমাত্র নির্ভর করে না; বরং এর মূল ভিত্তি হলো অন্তরের বিশুদ্ধতা, নৈতিক ভারসাম্য এবং আল্লাহভীতির উপস্থিতি। কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজে অশান্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কারণ হলো শয়তানের প্রভাব, যে ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তা, সম্পর্ক এবং আচরণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সামাজিক বন্ধনকে দুর্বল করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

(সূরা আল-মায়িদা : ৯১)

অর্থ: “নিশ্চয়ই শয়তান চায় তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে।”

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, সমাজে শত্রুতা কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়; বরং এটি একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রক্রিয়া, যার পেছনে শয়তানের কৌশল কাজ করে। তাফসীরে ইবনে

কাসীর অনুযায়ী, শয়তান মানুষের মধ্যে প্রথমে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে, এরপর সন্দেহ, তারপর ঘৃণা এবং শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا

(সহীহ মুসলিম : ২৫৫৯)

অর্থ: “তোমরা একে অপরের প্রতি ঘৃণা করো না, হিংসা করো না এবং সম্পর্ক ছিন্ন করো না।”

এই হাদীস সমাজে শান্তি বজায় রাখার মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে। যখন এই নির্দেশনা উপেক্ষা করা হয়, তখন শয়তান মানুষের আবেগ ও দুর্বলতাকে ব্যবহার করে বিভাজন তৈরি করে।

ইমাম ইবনুল জাওয়ী তাঁর “তালবীস ইবলিস” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শয়তানের অন্যতম বড় প্রতারণা হলো মানুষের মধ্যে তুলনা ও প্রতিযোগিতাকে ঘৃণা ও বিদ্বেষে রূপান্তর করা। সামান্য পার্থক্যকে সে বড় সংঘাতে পরিণত করে।

আধুনিক সমাজে এই বাস্তবতা আরও স্পষ্ট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বারবার তুলনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একজন অন্যজনের সাফল্য, সম্পদ বা জীবনধারা দেখে নিজের মধ্যে হীনতা বা অহংকার তৈরি করে। এই মানসিকতা ধীরে ধীরে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

“জ্বিন ও শয়তানের জগৎ” গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শয়তান আধুনিক যুগে মানুষের মনোযোগ ও আবেগকে ব্যবহার করে সমাজে বিভ্রান্তি তৈরি করে। সে সরাসরি সংঘাত সৃষ্টি না করে মানুষের চিন্তার ভেতর বিভাজন তৈরি করে।

সমাজে অশান্তির আরেকটি বড় কারণ হলো গীবত, অপবাদ এবং গুজব। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُم بَعْضًا

(সূরা আল-হুজুরাত : ১২)

অর্থ:“তোমরা একে অপরের গীবত করো না।”

তাফসীরবিদদের মতে, গীবত সমাজের আস্থা ধ্বংস করে এবং মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও দূরত্ব সৃষ্টি করে, যা শয়তানের অন্যতম কাক্ষিত ফলাফল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অহংকার। ইবলিসের ইতিহাসই এর সর্বোত্তম উদাহরণ।

আল্লাহ বলেন—

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

(সূরা আল-আ'রাফ : ১২)

অর্থ:“আমি তার চেয়ে উত্তম।”

এই অহংকারই তাকে অবাধ্যতায় নিয়ে যায়। সমাজে যখন এই মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ে—“আমি সঠিক, অন্যরা ভুল”—তখন পারস্পরিক সহনশীলতা নষ্ট হয় এবং সংঘাত বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তির আরেকটি বড় কারণ হলো যোগাযোগের দুর্বলতা এবং ভুল ব্যাখ্যা। একটি ছোট কথা, একটি বার্তা বা একটি পোস্ট অনেক সময় ভুলভাবে ব্যাখ্যা হয়ে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। শয়তান এই ভুল বোঝাবুঝিকেই শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে।

“শয়তানের চক্রান্ত” গ্রন্থে বলা হয়েছে, শয়তান কখনো সরাসরি সত্যকে অস্বীকার করতে বলে না; বরং সত্যের সাথে সামান্য বিকৃতি মিশিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হলো অন্তরের আধ্যাত্মিক শূন্যতা। যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, তখন অন্তরে অস্থিরতা জন্ম নেয়, যা বাহ্যিক আচরণেও প্রতিফলিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
(সূরা রাদ : ২৮)

অর্থ: “জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।”

এই প্রশান্তি না থাকলে সমাজে সহনশীলতা কমে যায় এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

একটি বাস্তব চিত্রে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি যখন মানসিকভাবে অস্থির থাকে, তখন সে পরিবারে রাগ প্রকাশ করে, ছোট বিষয়কে বড় করে তোলে এবং সম্পর্ক নষ্ট করে। এভাবে ব্যক্তিগত অশান্তি ধীরে ধীরে সামাজিক অশান্তিতে রূপ নেয়।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর স্মরণ, ক্ষমা, ধৈর্য এবং সং সম্পর্ক বজায় রাখা হলো মূল প্রতিকার।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا
(সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

অর্থ: “তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
(সহীহ বুখারী : ১০)

অর্থ: “প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।”

এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করলে সমাজে শত্রুতা কমে আসে এবং আস্থা বৃদ্ধি পায়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সমাজে অশান্তি শুধুমাত্র সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা নয়; বরং এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক সমস্যা, যার মূল শেকড় হলো শয়তানের কৌশল, মানুষের নফস এবং আধ্যাত্মিক দূরত্ব। এই তিনটি নিয়ন্ত্রণে এলে সমাজে শান্তি ও ভারসাম্য স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসে।

১২.পরিবার ধ্বংসে শয়তানের ভূমিকা ও নৈতিক বিচ্যুতির সামাজিক বাস্তবতা

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়েছে। এই সম্পর্ককে ভাঙতে শয়তান সবসময় চেষ্টা করে, কারণ পরিবার ভাঙলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হলো ঈমান, নৈতিকতা এবং মানবিক স্থিতিশীলতার মূল ভিত্তি। শয়তানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো এই ভিত্তিকে দুর্বল করা, কারণ পরিবার ভেঙে গেলে সমাজ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ

(সূরা ইসরা : ৫৩)

অর্থ: “নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।”

তাফসীরে ইবনে কাসীর অনুযায়ী, “نَزَعَ” অর্থ হলো সূক্ষ্মভাবে অন্তরে রাগ, সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝি ঢুকিয়ে দেওয়া।

দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙার সূক্ষ্ম কৌশল

শয়তান সরাসরি সম্পর্ক ভাঙে না; বরং ছোট ছোট আবেগ, ভুল বোঝাবুঝি ও অহংকার তৈরি করে।

আল্লাহ বলেন—

فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

(সূরা আল-বাকার : ১০২)

অর্থ: “তারা এমন জিনিস শেখে, যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।”

তাফসীর অনুযায়ী, এটি শয়তানি প্ররোচনা ও যাদুবিদ্যার মাধ্যমে সম্পর্ক নষ্ট করার বাস্তব ইঙ্গিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

ইবলিস তার সিংহাসন পানির উপর স্থাপন করে, তারপর সে তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কিন্তু ইবলিসের কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফিতনা সৃষ্টি করে।

তাদের একজন এসে বলে—আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। ইবলিস বলে—তুমি কিছুই করোনি।

আরেকজন এসে বলে—আমি এক ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। তখন ইবলিস তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—তুমিই সবচেয়ে বড় কাজ করেছো।

-সহীহ মুসলিম: ২৮১৩

-হাদীস একাডেমি নম্বর: ৬৯৯৯

-বর্ণনাকারী: জাবির (রাঃ)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়—

- শয়তানের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করা।
- বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো।
- ছোট রাগ ও সন্দেহকে বড় ঝগড়ায় পরিণত করা।

রাগ ও শয়তানের প্রবাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ
(সহীহ বুখারী : ৩২৮১, মুসলিম : ২১৭৫)

অর্থ: “শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো প্রবাহিত হয়।”

অর্থাৎ, সে মানুষের আবেগ ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

আধুনিক সমাজে পরিবার ভাঙনের রূপ

আজকের যুগে পরিবার ভাঙন শুধু ব্যক্তিগত নয়; বরং প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির মাধ্যমে আরও বিস্তৃত।

- অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া
- যোগাযোগের অভাব
- সন্দেহ ও ভুল তথ্য
- ভার্চুয়াল সম্পর্কের অতিরিক্ততা

“জিন ও শয়তানের জগৎ” গ্রন্থে বলা হয়েছে, শয়তান প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মানুষের মনোযোগ ও সম্পর্ক দুর্বল করে।

নৈতিক বিচ্যুতি ও ফিতরাতের বিপর্যয়

আল্লাহ বলেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ
(সূরা আল-আন‘আম : ১৫১)

অর্থ: “তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না।”

তাফসীর অনুযায়ী, শুধু কাজ নয়; বরং সেই পথে নিয়ে যায় এমন চিন্তা ও পরিবেশ থেকেও দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

সমকামিতার সূচনা, কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিণতি

মানব ইতিহাসে নৈতিক বিচ্যুতির সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায়গুলোর একটি হলো লুত (আ.)-এর কওমের ঘটনা, যেখানে প্রথমবারের মতো সমকামিতার মতো বিকৃত আচরণ প্রকাশ্যে দেখা যায়, যা পরিবার কাঠামো ধ্বংসের জন্যও দায়ী। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি কোনো আধুনিক ধারণা নয়; বরং একটি পুরনো জাতিগত বিকৃতি, যার পরিণতি কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
(সূরা আল-আ‘রাফ : ৮০)

অর্থ: “তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে পৃথিবীর কেউ করেনি?”

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, এটি ছিল মানব ইতিহাসে একটি নতুন ও চরম নৈতিক অবক্ষয়।

লূত (আ.)-এর কওম ও বিকৃত আচরণের সূচনা

তাফসীরে ইবনে কাসীর অনুযায়ী, লূত (আ.)-এর কওম প্রথমে স্বাভাবিক সমাজেই বসবাস করত, কিন্তু ধীরে ধীরে তারা নারীদের স্বাভাবিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে পুরুষদের প্রতি যৌন আকর্ষণে লিপ্ত হয়। এটি ছিল সমাজের ভেতরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়া একটি বিকৃতি, যা প্রথমে “পাপ” হিসেবে শুরু হলেও পরে “স্বাভাবিকতা” হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়।

আল্লাহ বলেন—

وَنَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

(সূরা আশ-শু‘আরা : ১৬৫)

অর্থ: “তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাদের ছেড়ে দিচ্ছ।”

আল্লাহর সতর্কতা ও শাস্তির ঘোষণা

লূত (আ.) তাদেরকে বহুবার সতর্ক করেন, কিন্তু তারা অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে। ফলে আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا

(সূরা হূদ : ৮২)

অর্থ: “যখন আমাদের শাস্তির নির্দেশ এলো, আমরা তাদের জনপদকে উল্টে দিলাম।”

তাফসীরে ইবনে কাসীর ব্যাখ্যা করেন, তাদের শহরকে উপরে নিচে উল্টে ফেলা হয় এবং এরপর তাদের উপর পাথর বর্ষণ করা হয়।

আরো বলা হয়েছে—

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ

(সূরা হূদ : ৮৩)

অর্থ: “আর আমরা তাদের উপর ধারাবাহিকভাবে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।”

সহীহ হাদীসে বর্ণিত কঠোর সতর্কতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَنْ وَجَدْتُمْهُ يَعْمَلْ عَمَلٌ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

(সুনান আবু দাউদ : ৪৪৬২)

অর্থ: “যে ব্যক্তি লূত (আ.)-এর কওমের কাজ করে, তাকে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কেই শাস্তি দাও।”

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইসলামী শরীয়তে এটি অত্যন্ত গুরুতর নৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য।

তাফসীর ও ইসলামি গ্রন্থের ব্যাখ্যা

তাফসীরে কুরতুবী ও ইবনে কাসীরসহ বহু মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, এই বিকৃতি ধীরে ধীরে সমাজে ছড়ায়—

- প্রথমে দৃষ্টির অবাধ্যতা।
- তারপর লজ্জাশীলতা হারানো।
- তারপর বিকৃত চিন্তার স্বাভাবিকীকরণ।
- শেষে প্রকাশ্য সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা দাবি করা।

ইমাম ইবনুল জাওয়াযী তাঁর “তালবীস ইবলিস” গ্রন্থে উল্লেখ করেন, শয়তান সমাজে কোনো পাপকে একদিনে প্রতিষ্ঠা করে না; বরং ধাপে ধাপে “স্বাভাবিকতা” হিসেবে উপস্থাপন করে।

আধুনিক সময়ের বাস্তবতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

বর্তমান যুগে মিডিয়া, ইন্টারনেট, বিনোদন এবং কিছু বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্রবাহের মাধ্যমে এই ধারণাগুলো বিভিন্ন সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক জায়গায় এটিকে মানবাধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিতে নৈতিকতা নির্ধারিত হয় না সমাজের প্রবণতা দ্বারা; বরং আল্লাহর বিধান দ্বারা।

আল্লাহ বলেন—

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

(সূরা ইউসুফ : ৪০)

অর্থ: “বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহর।”

পরিণতি ও শিক্ষা

কুরআনের আলোকে লুত (আ.)-এর কওমের পরিণতি ছিল ভয়াবহ—

- সম্পূর্ণ জনপদ ধ্বংস,
- পাথর বর্ষণে নিশ্চিহ্ন হওয়া,
- মানব ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থাপিত হওয়া।

আল্লাহ বলেন—

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ

(সূরা আল-হিজর : ৭৬)

“এ ঘটনা পথিকদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে।”

তাফসীর অনুযায়ী, তাদের ধ্বংস শুধু শাস্তি নয়, বরং ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য একটি সতর্কবার্তা।

মূল শিক্ষা

ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা পরিবর্তনযোগ্য নয়;
শয়তান ধীরে ধীরে সমাজকে বিকৃত চিন্তার দিকে নিয়ে যায়;
পাপ যখন “স্বাভাবিকতা” হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন তা সামাজিক ধ্বংস ডেকে
আনে;
আল্লাহর বিধানই চূড়ান্ত মানদণ্ড।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
(সূরা আল-আ'রাফ : ৮০)

অর্থ: “তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে কেউ করেনি?”

তাফসীরে ইবনে কাসীর অনুযায়ী, এই বিকৃতি ধীরে ধীরে সমাজে ছড়ায়—প্রথমে লজ্জা
কমে, পরে চিন্তা বিকৃত হয়, তারপর তা স্বাভাবিক মনে হতে শুরু করে।

আল্লাহ আরও বলেন—

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
(সূরা আশ-শু'আরা : ১৬৫)

অর্থ: “তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাদের ছেড়ে
দিচ্ছ।”

হাদীসের কঠোর সতর্কতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلًا قَوْمًا لَوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
(সুনান আবু দাউদ : ৪৪৬২)

অর্থ: “যে ব্যক্তি লূত (আ.)-এর কওমের কাজ করে, তাকে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কেই শাস্তি দাও।”

পরিবার রক্ষার ইসলামিক সমাধান

আল্লাহ বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
(সূরা রুম : ২১)

অর্থ: “তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা শান্তি পাব।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا
(সহীহ মুসলিম : ২৫৮৮)

অর্থ: “ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।”

পরিবার ভাঙন ও সামাজিক নৈতিক বিকৃতি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটি শয়তানের ধাপে ধাপে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। এতে আবেগ, প্রযুক্তি, চিন্তা ও সংস্কৃতি—সবই ব্যবহার করা হয়।

লূত (আ.)-এর কওমের ঘটনা কুরআনে একটি স্থায়ী দৃষ্টান্ত, যাতে বোঝা যায়—যখন ফিতরাত বিকৃত হয় এবং অশ্লীলতা স্বাভাবিকতা পায়, তখন তা শুধু ব্যক্তি নয়, পুরো সমাজের ধ্বংস ডেকে আনে।

আল্লাহর বিধান, নৈতিকতা ও পারিবারিক স্থিতিশীলতাই একমাত্র নিরাপদ পথ।

১৩. যুবসমাজ ও আধুনিক ফিতনা

যুবসমাজ জীবনের এমন এক পর্যায়, যেখানে শক্তি, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সবচেয়ে তীব্র থাকে। এই সময়টাই ভবিষ্যৎ চরিত্র ও জীবনের দিক নির্ধারণ করে দেয়। কুরআনের দৃষ্টিতে এই পর্যায়টি যেমন নেক কাজে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ, তেমনি শয়তানের জন্য সবচেয়ে সহজ প্রবেশদ্বারও।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
(সূরা আল-আ'রাফ : ২৭)

অর্থ: “হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে কোনোভাবেই ফিতনায় না ফেলে।”

এই সতর্কবার্তা থেকে বোঝা যায়, ফিতনা হঠাৎ আসে না; বরং ধীরে ধীরে মন, চিন্তা ও অভ্যাসকে আক্রমণ করে।

শয়তানের প্রথম আক্রমণ: চিন্তার বিকৃতি

শয়তানের প্রথম প্রভাব পড়ে চিন্তার ওপর—সে বাস্তবতাকে বিকৃত করে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে। যে জিনিস হারাম বা ক্ষতিকর, সেটাকেই সে “স্বাভাবিক” বা “আকর্ষণীয়” মনে করায়। কুরআনে বলা হয়েছে—

زُيِّنَ لَهُمُ السُّوءُ أَعْمَالَهُمْ
(সূরা তাওবা : ৩৭)

অর্থ: “তাদের কাছে তাদের মন্দ কাজগুলোকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে।”

যুবসমাজের ক্ষেত্রে এটি খুব স্পষ্ট—অনিয়ন্ত্রিত বিনোদন, অশ্লীল কনটেন্ট, অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক এবং সময় নষ্টকে সে “স্বাধীনতা” বা “লাইফস্টাইল” হিসেবে উপস্থাপন করে।

ধাপে ধাপে পতনের কৌশল: “খুতুওয়াত” এর বাস্তবতা

এরপর শয়তান ধাপে ধাপে অভ্যাস তৈরি করে। প্রথমে ছোট গাফিলতি, তারপর নিয়মিততা, এরপর আসক্তি। কুরআনে এই ধারাকেই সতর্ক করা হয়েছে—

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
(সূরা আন-নূর : ২১)

অর্থ: “যে শয়তানের পদক্ষেপ অনুসরণ করে, সে তাকে অশ্লীলতা ও অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়।”

এখানে “পদক্ষেপ” শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ—অর্থাৎ এক লাফে পতন নয়, বরং ধাপে ধাপে নিচে নামা।

আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিণতি

যুবসমাজের আরেকটি বড় দুর্বলতা হলো একাকীত্ব ও পরিচয় সংকট। যখন মানুষ সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে দূরে থাকে, তখন শয়তান তাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে—

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
(সূরা আয-যুখরুফ : ৩৬)

অর্থ: “যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তানকে সঙ্গী করে দিই।”

এখানেই মূল বিপদ—সঙ্গী বদলে গেলে চিন্তাও বদলে যায়।

আধুনিক ফিতনা: প্রযুক্তির নীরব প্রভাব

বর্তমান যুগে এই ফিতনা আরও বিস্তৃত হয়েছে প্রযুক্তির মাধ্যমে। মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া, শর্ট ভিডিও, ভার্চুয়াল সম্পর্ক—সবকিছুই সময়কে দ্রুত গ্রাস করে ফেলে। অনেক যুবক ভাবে “কিছুক্ষণের জন্য দেখি”, কিন্তু সেই “কিছুক্ষণ” ধীরে ধীরে জীবনের লক্ষ্য নষ্ট করে দেয়।

এটাই শয়তানের সবচেয়ে সূক্ষ্ম কৌশল—সে বড় ধ্বংস দিয়ে শুরু করে না, বরং ছোট অবহেলা দিয়ে শুরু করে, যা মানুষ গুরুত্বই দেয় না।

একাকীত্ব, সঙ্গ ও মানসিক ভাঙন

যুবসমাজের উপর প্রভাব ফেলার আরেকটি বড় ক্ষেত্র হলো সঙ্গ ও পরিবেশ। ভুল সঙ্গ মানুষকে ধীরে ধীরে দিকহীন করে ফেলে। আর একাকীত্ব তাকে চিন্তা ও ওয়াসওয়াসার মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে মানুষ বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কুরআনিক নির্দেশনা: স্থিতিশীল জীবনের ভিত্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবসমাজকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখিয়েছেন—আকাজ্জাককে নিয়ন্ত্রণ, দৃষ্টিকে হেফাজত, এবং জীবনে লক্ষ্য স্থির রাখা।

সমাধান হিসেবে কুরআন তিনটি শক্ত ভিত্তি দিয়েছে—

আল্লাহর স্মরণে থাকা, কারণ এতে অন্তর স্থির হয়।

সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা, কারণ মানুষ তার পরিবেশ দ্বারা গঠিত হয়;

এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ, কারণ প্রতিটি সিদ্ধান্তের দায় মানুষকেই নিতে হয়।

সচেতনতার মাধ্যমে আত্মরক্ষা

যুবসমাজের উপর শয়তানের প্রভাব কোনো একক আক্রমণ নয়, বরং ধাপে ধাপে তৈরি হওয়া একটি মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণগত পরিবর্তন। যে ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া বুঝে সতর্ক থাকে, তার জন্য শয়তানের কৌশল কেবল দুর্বল প্রভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর যে অজান্তে এগিয়ে যায়, তার জন্য তা ধ্বংসের পথে রূপ নেয়।

১৪.মোবাইল, ইন্টারনেট ও শয়তানের প্রভাব

মোবাইল ও ইন্টারনেট আধুনিক জীবনের শক্তিশালী মাধ্যম। এর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন, যোগাযোগ ও দাওয়াত সহজ হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে শয়তানের কৌশল খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করে—মানুষের মনোযোগ, সময় এবং অন্তরকে ধীরে ধীরে গাফিলতির দিকে নিয়ে যায়।

মনোযোগ বিভাজন ও গাফিলতির সূচনা

মোবাইল ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মনোযোগ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া। একদিকে ইবাদত বা কাজ, অন্যদিকে বারবার নোটিফিকেশন ও কনটেন্টের টান।

কুরআনে বলা হয়েছে—

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ

(সূরা আত-তাকাসুর : ১)

অর্থ: “অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফিল করে রেখেছে।”

মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যে ব্যস্ততা মানুষকে মূল উদ্দেশ্য (আখিরাত) থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সেটাই গাফিলতির রূপ।

আকর্ষণ, অভ্যাস ও ধাপে ধাপে পতন

শয়তান কখনো একবারে মানুষকে বড় গুনাহে নিয়ে যায় না। বরং ছোট আকর্ষণ তৈরি করে অভ্যাসে পরিণত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
(সূরা আল-বাকার : ১৬৮)

অর্থ: “তোমরা শয়তানের পদক্ষেপ অনুসরণ করো না।”

এই “পদক্ষেপ” মানে ছোট ছোট গাফিলতি—যা ধীরে ধীরে বড় আসক্তিতে পরিণত হয়।

অন্তরের দুর্বলতা ও একাকীত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম : ৩২৮১)

অর্থ: “শয়তান মানুষের রক্তের মতো প্রবাহিত হয়।”

যখন মানুষ একা হয়ে যায়—বিশেষ করে রাত জেগে মোবাইল ব্যবহার করে—তখন চিন্তার উপর শয়তানের প্রভাব আরও শক্তিশালী হয়। তখনই ভুল কনটেন্ট, অপ্রয়োজনীয় চিন্তা এবং ওয়াসওয়াসা বৃদ্ধি পায়।

অশ্লীলতা ও অনিয়ন্ত্রিত কনটেন্ট

ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীলতা সহজলভ্য হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
(সূরা আন-নূর : ৩০)

অর্থ: “মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে।”

তাফসীর অনুযায়ী, দৃষ্টি সংযত না করলে ধীরে ধীরে অন্তর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গুনাহ সহজ মনে হয়।

সময় নষ্ট: শয়তানের নীরব বিজয়

ইবনুল জাওয়াযী (রহ.) তাঁর “তালবীস ইবলিস” গ্রন্থে উল্লেখ করেন, শয়তান মানুষকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখে যা সরাসরি হারাম না হলেও তাকে মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বর্তমান বাস্তবতায় এটি দেখা যায়—

“একটু স্ক্রল” → সময় হারানো → ঘুম নষ্ট → ইবাদত দুর্বল হওয়া।

প্রতিকার ও আত্মরক্ষা

কুরআন ও হাদীস এই ফিতনা থেকে বাঁচার স্পষ্ট পথ দিয়েছে—

-সময়কে নিয়ন্ত্রণ করা।

وَالْعَصْرِ

(সূরা আল-আসর : ১)

-আল্লাহর স্মরণ বৃদ্ধি করা।

(সূরা আল-বাকার : ১৫২)

- ইবাদতকে জীবনের কেন্দ্র বানানো।
- চক্ষু ও মন নিয়ন্ত্রণ করা।
- সৎ সঙ্গ ও বাস্তব জীবনের সম্পর্ক শক্ত করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ
(সহীহ বুখারী : ৬৪১২)

অর্থ: “দুটি নিয়ামত আছে, যা অধিকাংশ মানুষ নষ্ট করে—স্বাস্থ্য ও অবসর সময়।”

মোবাইল ও ইন্টারনেট নিজে ফিতনা নয়; কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার শয়তানের জন্য একটি শক্তিশালী সুযোগ তৈরি করে। সে এখানে সময় নষ্ট, আসক্তি, দৃষ্টি ভ্রষ্টতা এবং গাফিলতির মাধ্যমে মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

যে ব্যক্তি সচেতন, তার জন্য এটি নেয়ামত; আর যে অজান্তে চলে, তার জন্য এটি একটি নীরব ফাঁদ।

১৫. অহংকার, হিংসা ও হতাশা

কুরআনের আলোকে শয়তানের অন্যতম প্রধান কৌশল হলো মানুষের অন্তরের ভেতর থেকে তাকে দুর্বল করা। সে সরাসরি মানুষকে ধ্বংস করে না; বরং তিনটি মানসিক ব্যাধি সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে ঈমান, সম্পর্ক ও আত্মিক শক্তি নষ্ট করে—অহংকার, হিংসা এবং হতাশা।

অহংকার: সত্য প্রত্যাখ্যানের সূচনা

শয়তানের প্রথম অপরাধ ছিল অহংকার। সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল, ফলে চিরতরে অভিশপ্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
(সূরা আল-বাকার : ৩৪)

অর্থ: “সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।”

তাফসীর অনুযায়ী, ইবলিসের ভুল ছিল নিজের যুক্তিকে আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রাধান্য দেওয়া। এটি শুধু একটি আচরণগত ভুল নয়, বরং অন্তরের রোগ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
(সহীহ মুসলিম : ৯১)

অর্থ: “যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

অহংকার মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে।

হিংসা: অন্তরের অগ্নি

হিংসা এমন একটি ব্যাধি যা মানুষের অন্তরকে শান্তি থেকে বঞ্চিত করে এবং অন্যের ভালোকে সহ্য করতে দেয় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

(সুনান আবু দাউদ : ৪৯০৩)

অর্থ: “তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে ধ্বংস করে।”

তাফসীরবিদরা বলেন, হিংসা শয়তানের এমন একটি ফাঁদ, যা মানুষকে নিজের অবস্থায় অখুশি রাখে এবং অন্যের ক্ষতি কামনায় বাধ্য করে। ফলে সমাজে দ্বন্দ্ব, ঘৃণা ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়।

হতাশা: শয়তানের শেষ অস্ত্র

শয়তান শুধু গুনাহ করায় না; বরং গুনাহের পর মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে তোলে। সে মনে করিয়ে দেয়—“তুমি আর ক্ষমার যোগ্য নও।”

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّهُ لَا يَنْيَأُسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

(সূরা ইউসুফ : ৮৭)

অর্থ: “আল্লাহর রহমত থেকে কেবল কাফিররা হতাশ হয়।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

(সুনান তিরমিজি : ২৪৯৯)

অর্থ: “প্রত্যেক মানুষই ভুলকারী, আর উত্তম ভুলকারী হলো যারা তাওবা করে।”

আরেক হাদীসে এসেছে—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ
(সহীহ মুসলিম : ২৭৪৯)

অর্থ: “যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তবে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে এমন জাতি আনতেন যারা গুনাহ করে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে।”

এই হাদীসগুলো স্পষ্ট করে—হতাশা নয়, বরং তাওবা ও প্রত্যাবর্তনই ঈমানের পথ।

অহংকার মানুষকে সত্য অস্বীকার করায়, হিংসা অন্তরকে অশান্ত করে এবং সম্পর্ক ধ্বংস করে, আর হতাশা মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই তিনটি অবস্থাই শয়তানের সূক্ষ্ম মানসিক অস্ত্র, যা বাহ্যিক আক্রমণ নয় বরং অন্তরের ভেতর থেকে মানুষকে দুর্বল করে।

যে ব্যক্তি এগুলো চিহ্নিত করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তার জন্য শয়তানের কৌশল কেবল দুর্বল প্রভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে।

১৬.জাদু, বদনজর ও জিনের প্রভাব:শয়তানের অদৃশ্য মাধ্যম

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে যে অদৃশ্য ক্ষতি ও অস্থিরতা দেখা যায়, তার একটি অংশ জাদু (সিহর), বদনজর (‘আইন) এবং জিনের প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এগুলো বাস্তব, তবে সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জাদুর বাস্তবতা ও প্রভাব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
(সূরা আল-বাকারাহ : ১০২)

অর্থ: “তারা কাউকে কিছু শেখাত না যতক্ষণ না বলত—আমরা তো পরীক্ষা মাত্র, তাই তুমি কুফর করো না।”

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, জাদু মূলত একটি ফিতনা—যা মানুষের ঈমান, সম্পর্ক এবং মানসিক স্থিতি পরীক্ষা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ
(সহীহ বুখারী : ৩২৮১)

অর্থ: “শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মতো চলাচল করে।”

এই গভীর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, শয়তান মানুষের চিন্তা, আবেগ ও দুর্বলতার ভেতর দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে—যার ফল হিসেবে অনেক সময় জাদু, সন্দেহ বা মানসিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

বদনজর (আল-আইন)

বদনজর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

الْعَيْنُ حَقٌّ
(সহীহ মুসলিম : ২১৮৮)

অর্থ: “বদনজর সত্য।”

অর্থাৎ মানুষের হিংসা বা অতিরিক্ত দৃষ্টির কারণে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে, তবে তা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কার্যকর হয় না।

জিনের প্রভাব

জিন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ
(সূরা আল-জিন : ৬)

অর্থ: “মানুষ জিনদের কিছু দলের আশ্রয় নিত।”

তাফসীর অনুযায়ী, জিন মানুষের উপর কুমন্ত্রণা দিতে পারে, ভয় সৃষ্টি করতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে মানসিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারে, তবে তাদের ক্ষমতা সীমিত এবং সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন।

শয়তানের সাথে সম্পর্ক

এই তিনটি বিষয়—জাদু, বদনজর ও জিন—শয়তানের কৌশলের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই সকল বিষয়কে ইসলামে অদৃশ্য ফিতনা হিসেবে দেখা হয়, যা মানুষের ঈমানকে দুর্বল করার একটি মাধ্যমও হতে পারে। শয়তান এগুলোকে ব্যবহার করে মানুষের মনে ভয়, সন্দেহ ও হতাশা সৃষ্টি করে ঈমান দুর্বল করতে চায়।

১৭. শয়তানের চূড়ান্ত লক্ষ্য

শয়তানের মূল উদ্দেশ্য মানবজাতিকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্যুত করা এবং শেষ পর্যন্ত ঈমান নষ্ট করা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা শয়তানের স্পষ্ট ঘোষণা উল্লেখ করেছেন, যেখানে সে বলেছে—

“আমি অবশ্যই তাদের জন্য তোমার সরল পথের উপর বসে থাকব...”

(সূরা আল-আ'রাফ : ১৬-১৭)

তাফসীর ইবনে কাসীর (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই আয়াত থেকে বোঝা যায় শয়তান মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে—শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য—সব সময় তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তার লক্ষ্য শুধু গুনাহ করানো নয়, বরং ধীরে ধীরে ঈমান দুর্বল করে শেষ পর্যন্ত তা নষ্ট করা।

শয়তানের ধাপে ধাপে চক্রান্ত

আলেমদের ব্যাখ্যায় (তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা ইবরাহীম ২২ এর আলোচনায়) শয়তানের কৌশল ধাপে ধাপে হয়—

১. প্রথমে সন্দেহ সৃষ্টি করে

২. এরপর গুনাহকে সুন্দর করে দেখায়

৩. তারপর অভ্যাসে পরিণত করে

৪. শেষে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়

এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় হলো মানুষের মৃত্যু মুহূর্ত।

মৃত্যু মুহূর্তে শয়তানের চূড়ান্ত আক্রমণ

হাদীসের আলোকে জানা যায়, শয়তান মানুষের জীবনের শেষ সময়েও তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে। এজন্য নবী ﷺ ঈমানের উপর অটল থাকার গুরুত্ব অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

“যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

- সুনান আবু দাউদ : ৩১১৬

-মুসনাদ আহমদ : ২২০৮৪

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, মৃত্যুর সময় ঈমান রক্ষা করা সবচেয়ে বড় সফলতা।

সীরাত ও সাহাবাদের শিক্ষা

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মৃত্যুকে সবসময় ঈমানের পরীক্ষার মুহূর্ত হিসেবে দেখতেন। তাঁরা শেষ সময়ে বেশি বেশি যিকির, দোয়া ও তাওহীদের কালিমা পাঠ করতেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.) তাঁর “তালবীস ইবলিস” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা হলো মানুষকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গাফেল রাখা।

সব মিলিয়ে বোঝা যায়, শয়তানের চূড়ান্ত লক্ষ্য তিনটি স্তরে প্রকাশ পায়—

১. ব্যক্তিগত জীবনে গুনাহ ও ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করা।

২. সমাজে শিরক ও গোমরাহি বিস্তার করা।

৩. সর্বশেষ মৃত্যুর মুহূর্তে ঈমান নষ্ট করার চেষ্টা করা।

শয়তানের চক্রান্ত শুধু দুনিয়াবি বিভ্রান্তি নয়; বরং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানুষের আখিরাত নষ্ট করা। তাই একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে থাকা, কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঈমান রক্ষার চেষ্টা করা।

১৮.রুকিয়াহ কী: পরিচয় ও গুরুত্ব

শয়তানের চক্রান্ত ও ফিতনা বোঝার পর একজন মুমিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো আত্মিক সুরক্ষার পথ জানা। এই সুরক্ষার অন্যতম মাধ্যম হলো রুকিয়াহ শরয়ীহ, যা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক আমল। ইসলামে এসব অদৃশ্য ক্ষতি থেকে বাঁচার মূল পথ হলো রুকিয়াহ। রুকিয়াহ হলো কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীসে বর্ণিত দোয়া এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলি দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি ও ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে শিফা ও সুরক্ষা চাওয়ার পদ্ধতি। এটি কোনো কুসংস্কার বা গোপন শক্তি নয়; বরং সরাসরি সুন্নাহভিত্তিক চিকিৎসা ও আত্মিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন—

কুরআন মুমিনের জন্য “হিদায়াত ও শিফা”—যে ব্যক্তি ঈমানসহ কুরআন ব্যবহার করে, তার অন্তর ও জীবন উভয়ই সুস্থ হয়।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর “আত-তিব্বুন নাবাবী” গ্রন্থে বলেন—

রুকিয়াহ হলো আত্মিক চিকিৎসা, যার শক্তি আসে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًَا

(সহীহ মুসলিম : ২২০০)

অর্থ: “রুকিয়াহ করা বৈধ, যতক্ষণ না এতে শিরক থাকে।”

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, রুকিয়াহ ইসলামে অনুমোদিত একটি ইবাদত-ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যার শর্ত হলো—শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং শিরকমুক্ত থাকা।

আল্লাহ তাআলা কুরআন সম্পর্কে বলেন—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(সূরা আল-ইসরা : ৮২)

অর্থ: “আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাজিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।”

তাবীসীরবিদদের মতে, এই শিফা শুধু শারীরিক রোগ নয়; বরং অন্তরের সন্দেহ, ভয়, ওয়াসওয়াসা এবং মানসিক অস্থিরতারও চিকিৎসা।

রুকিয়াহর গুরুত্ব

রুকিয়াহ একজন মুমিনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি তাকে অদৃশ্য বিপদ—যেমন জাদু, বদনজর, জিনের কুমন্ত্রণা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা—থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে নিয়ে যায়। এটি মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং ঈমানকে দৃঢ় রাখে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অসুস্থতা ও কষ্টের সময় কুরআনের মাধ্যমে রুকিয়াহ করতেন এবং সাহাবীদেরও শেখাতেন। এটি প্রমাণ করে যে, রুকিয়াহ শুধু চিকিৎসা নয়; বরং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের বাস্তব প্রকাশ।

অর্থাৎ, রুকিয়াহ হলো কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক একটি আত্মিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা মানুষকে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কে আরও শক্তিশালী করে।

১৯.রুকিয়াহ সূরা ও দোয়া

রুকিয়াহ ও হিফাজতের এই আমলগুলো মূলত একজন মুমিনের দৈনন্দিন আত্মিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এগুলো অন্তরকে শক্তিশালী করে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা দুর্বল করে এবং জাদু, বদনজর ও মানসিক অস্থিরতা থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও নিয়মিত এসব আমল করতেন এবং সাহাবীদের শিক্ষা দিতেন।

শয়তান আমাদের প্রকাশ্যে শত্রু। দ্বীনের কাজ করলে শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পায়। শয়তান বিভিন্নভাবে আমাদের বিভ্রান্ত করে এবং দ্বীনের পথ থেকে সরিয়ে দেয়। শয়তানের সাথে সাথে বদনজর, হাসাদ, সহরের মতো সমস্যাসমূহ হতে হেফাজতের জন্য নিয়মিত আমল চালিয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যক। প্রত্যহ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ফেরেশতাদের ন্যায় শয়তানের বাহিনীও পালা বদল করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সকালের আমলসমূহ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সন্ধ্যার আমলসমূহ মাগরিবের পূর্বে বা পরে আদায় করতে হয়। মাগরিব পরবর্তী আমলসমূহ ফজর পর্যন্ত এবং ফজর পরবর্তী আমলসমূহ মাগরিব পর্যন্ত হিফাজত করে।

কুরআনের আয়াত ও যিকির যে শয়তানের বিরুদ্ধে একজন মুমিনের জন্য শক্তিশালী আত্মিক সুরক্ষা—এ বিষয়ে সহীহ হাদীসে বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আবু হুরাইরা (রা.) ও শয়তানের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেখানে শয়তান নিজেই আয়াতুল কুরসীর হিফাজতের কথা স্বীকার করেছে।

আয়াতুল কুরসীর হিফাজত : এক বিস্ময়কর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের সদকাতুল ফিতরের সম্পদ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সদকার খাদ্যসামগ্রী থেকে মুঠো মুঠো করে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, “আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব।”

সে বলল, “আমি খুব অভাবগ্রস্ত। আমার পরিবার-পরিজন অনেক এবং আমি কঠিন প্রয়োজনে আছি।”

তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,
“হে আবু হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দি কী করেছিল?”

আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে তার অভাব ও পরিবারের কথা বলেছিল, তাই আমি তার প্রতি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,
“সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামতো আমি বুঝলাম সে আবার আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় রইলাম।

সে আবার এসে খাদ্যসামগ্রী থেকে মুঠো মুঠো নিতে শুরু করল। আমি তাকে ধরে বললাম, “এবার অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব।”

সে বলল, “আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবী, আমার পরিবার বড়। আমি আর আসব না।”

আমি আবার তার প্রতি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,
“তোমার বন্দি কী করেছিল?”

আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে তার দারিদ্র্য ও পরিবারের কথা বলেছিল, তাই আমি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

“সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।”

তৃতীয় রাতেও আমি সতর্কভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে আবার এসে খাদ্যসামগ্রী নিতে শুরু করল। আমি তাকে ধরে বললাম,

“এবার অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। এটা তৃতীয়বার। তুমি প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি দাও যে আর আসবে না, কিন্তু আবার ফিরে আসো।”

তখন সে বলল,

“আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দেব, যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে উপকার করবেন।”

আমি বললাম, “সেগুলো কী?”

সে বলল,

“যখন তুমি ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসি পড়বে—

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

থেকে পুরো আয়াত শেষ পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করবেন, যে সকাল পর্যন্ত তোমার সাথে থাকবে। আর কোনো শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।”

তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

“গত রাতে তোমার বন্দি কী করেছিল?”

আমি বললাম,

“সে বলেছে, সে আমাকে এমন কিছু কথা শিখাবে যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে উপকার করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন,

“সেগুলো কী?”

আমি বললাম,

“সে আমাকে বলেছে, ঘুমানোর সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতুল কুরসি পড়তে—

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

এবং সে আরও বলেছে, যদি আমি তা করি, তাহলে আল্লাহ একজন প্রহরী নিযুক্ত করবেন, যিনি সকাল পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন এবং কোনো শয়তান আমার কাছে আসতে পারবে না।”

(বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবিগণ কল্যাণের বিষয় জানার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন।)

তখন নবী ﷺ বললেন—

“সে তোমাকে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে মহা মিথ্যাবাদী।”

অতঃপর তিনি বললেন—

“হে আবু হুরাইরা! তুমি কি জানো, এই তিন রাত তুমি কার সাথে কথা বলেছিলে?”

আবু হুরাইরা (রাযি.) বললেন, “না।”

নবী ﷺ বললেন—

“সে ছিল শয়তান।”

তথ্যসূত্র: সহীহ বুখারী : ২৩১১

২০. বাধ্যতামূলক হিফাজতের আমল

সূরা আল-ফাতিহা (১-৭ বার)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(আয়াতুল কুরসি:সকাল-সন্ধ্যায় ১ বার)

আয়াতুল কুরসী প্রত্যেক নামাজের পর একবার করে আমল করতে হবে।

সূরা আল-বাকারা : ২৫৫

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস:সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে)

তিন কুল ফজর ও মাগরিবের পর তিনবার করে এবং তিন ওয়াক্ত নামাজের (জোহর,আসর,এশা) পর একবার করে আমল করতে হবে।

সূরা আল-ইখলাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সূরা আল-ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

সূরা আন-নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مَلِكِ النَّاسِ
إِلَهِ النَّاسِ
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের আগে এগুলো পড়ে শরীরে ফুঁ দিতেন। (সহীহ বুখারী)

হাদিসের দুআ:সকাল-সন্ধ্যায় (৩ বার)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হাদিসের দুআ:সকাল-সন্ধ্যায় (৩ বার)

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

সূরা তাওবার ১২৯ নং আয়াতের অংশ: সকাল সন্ধ্যায়(৭ বার)

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

শয়তানের প্রভাব হতে সুরক্ষা: (সকাল সন্ধ্যায় ১০০ বার)

তবে রুকাইয়া সংক্রান্ত কোনো সমস্যা না থাকলে ১০ বার করে আমল করলেও চলবে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তাসবিহ ফাতিমী (ঘুমের আগে)

سُبْحَانَ اللَّهِ — ৩৩ বার

الْحَمْدُ لِلَّهِ — ৩৩ বার

اللَّهُ أَكْبَرُ — ৩৪ বার

হিফাজতের আমলের গুরুত্ব

এই আমলগুলো কেবল মুখস্থ কিছু দোয়া নয়; বরং একজন মুমিনের আত্মিক ঢাল। নিয়মিত যিকির ও কুরআনের আমল অন্তরকে জীবিত রাখে, ঈমানকে দৃঢ় করে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা দুর্বল করে দেয়। কুরআনের আলোকে আল্লাহর স্মরণই অন্তরের প্রকৃত প্রশান্তি ও নিরাপত্তার উৎস। যে ব্যক্তি নিয়মিত এসব আমল করে, সে

আল্লাহর হিফাজতের মধ্যে থাকে এবং তার অন্তর ধীরে ধীরে গাফিলতি ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত হতে শুরু করে।

এছাড়া জাদু বা সিহর, জ্বিনের আসর, বদনজর, ওয়াসওয়াসা, শয়তানি কুমন্ত্রণা ও বিভিন্ন আত্মিক সমস্যার ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক রুকিয়াহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। তবে এসব বিষয়ের সঠিক পদ্ধতি, সীমা ও শরয়ী নিয়ম জানা জরুরি, যেন কুসংস্কার, শিরক বা ভ্রান্ত চিকিৎসাপদ্ধতিতে জড়িয়ে পড়তে না হয়।

এ কারণে রুকিয়াহ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা, বিভিন্ন আয়াত ও দোয়ার প্রয়োগ, আত্মরক্ষার নিয়ম, জাদু ও বদনজরের লক্ষণ এবং শরয়ী চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ভরযোগ্য “রুকিয়াহ শরীয়াহ” বিষয়ক গ্রন্থ থেকে জেনে নেওয়া উপকারী। এসব গ্রন্থে কুরআন, সহীহ হাদীস ও সালাফদের ব্যাখ্যার আলোকে বিষয়গুলো আরও বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২১.চেকলিস্ট

এই চেকলিস্টটি পাঠকের জন্য একটি সহজ ও অনুসরণযোগ্য দৈনিক রুকিয়াহ ও হিফাজতের গাইড হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু যিকির ও আমল সংক্ষেপে সাজানো হয়েছে, যাতে একজন পাঠক সহজেই নিজের দৈনন্দিন জীবনে তা অনুসরণ করতে পারেন।

নিয়মিত এই আমলগুলো অনুসরণ করলে অন্তর প্রশান্ত হয়, ঈমান শক্তিশালী থাকে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা, ওয়াসওয়াসা, জাদু ও বদনজরের প্রভাব থেকে আল্লাহর হিফাজত লাভ করা যায়।

আত্মরক্ষা ও রুকিয়াহ চেকলিস্ট

- ☐ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মতো আদায় করা
- ☐ ফজর ও এশার সালাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া
- ☐ সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকির নিয়মিত পড়া
- ☐ সূরা ফাতিহা ১-৭ বার পড়া
- ☐ আয়াতুল কুরসি সকাল, সন্ধ্যা ও ঘুমের আগে পড়া
- ☐ ৩ কুল (ইখলাস, ফালাক, নাস) ৩ বার করে পড়া
- ☐ “...أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ” ৩ বার পড়া
- ☐ “...بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ” ৩ বার পড়া
- ☐ “...حَسْبِيَ اللَّهُ” ৭ বার পড়া
- ☐ “...لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ” ১০ বার পড়া
- ☐ ঘুমের আগে তাসবিহ ফাতিমী পড়া
- ☐ ঘুমের আগে ওয়ু করা
- ☐ ঘরে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত চালু রাখা
- ☐ সূরা আল-বাকারাহ ঘরে তিলাওয়াত করা
- ☐ হারাম গান, অশ্লীলতা ও খারাপ কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা
- ☐ চোখ, কান ও অন্তরের হেফাজত করা

- ☐ রাগ নিয়ন্ত্রণ ও বেশি বেশি ইস্তিগফার করা
- ☐ বেশি বেশি “اَسْتَغْفِرُ اللهَ” পড়া
- ☐ সৎ ও দ্বীনদার সঙ্গ গ্রহণ করা
- ☐ একাকীত্ব ও অতিরিক্ত গাফিলতি এড়িয়ে চলা
- ☐ খাবার, ঘুম ও ঘরে প্রবেশের সময় “বিসমিল্লাহ” বলা
- ☐ কুসংস্কার, তাবিজ ও শিরকী চিকিৎসা থেকে বেঁচে থাকা
- ☐ আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখা
- ☐ নিয়মিত তাওবা ও দোয়া করা

শয়তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা হলো জীবন্ত ঈমান, নিয়মিত যিকির এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখা। কুরআনের আমল, সালাত ও হালাল জীবন একজন মুমিনের জন্য আত্মিক ঢালস্বরূপ। যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে যায়, তখন শয়তানের প্রভাব বৃদ্ধি পায়; আর যখন সে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে, তখন অন্তর প্রশান্ত ও নিরাপদ হয়ে ওঠে।

২২.কিয়ামতের দিন শয়তানের পরিণতি

ইসলামী আকীদার আলোকে শয়তান (ইবলিস) হলো সেই বিদ্রোহী জিন, যে অহংকারের কারণে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে অভিশপ্ত হয়েছে এবং মানবজাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য অবকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, তার পুরো ইতিহাসই এক চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসরমান একটি পরিকল্পিত পতনের কাহিনি।

আল্লাহ তাআলা ইবলিসের অবাধ্যতার পর তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে এটি কোনো সম্মান নয়; বরং একটি পরীক্ষা ও তার অপকর্ম প্রকাশের সুযোগ।

কুরআনের দৃষ্টিতে শয়তানের শেষ পরিণতি

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ
(সূরা আল-আ'রাফ : ১৬)

অর্থ: “তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, তাই আমি তোমার সরল পথে তাদের জন্য বসে থাকব।”

এই ঘোষণা থেকেই বোঝা যায়, শয়তানের লক্ষ্য হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা—কিন্তু তার ক্ষমতা শুধু প্ররোচনার মধ্যেই সীমিত।

আর কিয়ামতের দিনে তার চূড়ান্ত স্বীকারোক্তি হবে—

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
(সূরা ইবরাহীম : ২২)

অর্থ: “বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর শয়তান বলবে—আল্লাহ তোমাদের সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর আমি তোমাদের প্রতারণা করেছি।”

তাফসীর ইবনে কাসীর অনুযায়ী, এই আয়াত শয়তানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ ও অপমান প্রকাশ করে। সে কিয়ামতের দিন তার অনুসারীদের সামনে সত্য স্বীকার করবে যে, সে শুধু ডাক দিয়েছিল; কিন্তু জোর করে কাউকে বাধ্য করেনি। ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছায় তার অনুসরণ করেছে।

কুরআনে আরও বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন শয়তান ও তার অনুসারীরা জাহান্নামে একত্রিত হবে এবং একে অপরকে দোষারোপ করবে।

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا

(সূরা আল-আ'রাফ : ৩৮)

অর্থ: “প্রত্যেক দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা অন্য দলকে অভিশাপ দেবে।”

তাফসীর অনুযায়ী, এখানে বোঝানো হয়েছে—অনুসারীরা শয়তানকে দোষ দেবে, আর শয়তান বলবে তার কাজ ছিল শুধু প্ররোচনা; সিদ্ধান্ত ছিল মানুষের নিজের।

কিয়ামতের দিন চূড়ান্ত পরিণতি

শয়তান ও তার অনুসারীদের শেষ গন্তব্য হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তারা সেখানে একে অপরের শত্রু হবে, কিন্তু কোনো মুক্তি পাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَتَّبِعُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

(সূরা সাদ : ৮৫)

অর্থ: “আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব তোমাকে (শয়তান) এবং তোমার অনুসারীদের দিয়ে।”

শিক্ষা

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়, শয়তানের পুরো কৌশলই ধোঁকা ও প্রলোভনের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু তার শেষ পরিণতি অপমান, লানত ও চিরস্থায়ী শাস্তি। সে নিজেই কিয়ামতের দিন নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করবে এবং মানুষকে দোষ দিলেও কোনো মুক্তি পাবে না।

অতএব, শয়তানের পথ যতই আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন, তার শেষ পরিণতি ধ্বংস—আর আল্লাহর পথে থাকা মানুষের জন্যই প্রকৃত মুক্তি ও সফলতা।

২৩. উপসংহার

মানবজীবন এক নীরব কিন্তু অবিরাম পরীক্ষার ময়দান—যেখানে একদিকে সত্য, হেদায়েত ও আল্লাহর নূর, আর অন্যদিকে শয়তানের সূক্ষ্ম ফিসফিসানি, প্রলোভন ও বিভ্রান্তির পথ। কুরআনের আলোকে শয়তান কখনো সরাসরি মানুষকে বাধ্য করে না; বরং সে ধীরে ধীরে হৃদয়ে প্রবেশ করে—গাফিলতির ছায়ায়, অহংকারের মাধুর্যে, আর হতাশার অন্ধকারে।

ইবনে জাওয়ী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “তালবীস ইবলিস”-এ বলেন—

“শয়তান মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু; তার সবচেয়ে সফল কৌশল হলো মানুষকে ধাপে ধাপে অভ্যস্ত করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া।”

এই কথার মধ্যেই শয়তানের পুরো কৌশলের চিত্র ফুটে ওঠে—সে একবারে পতন ঘটায় না, বরং ছোট ছোট গাফিলতি ও অভ্যাসের মাধ্যমে মানুষকে ধীরে ধীরে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

কুরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, শয়তানের কাজ শুধু ডাক দেওয়া; পথ বেছে নেওয়া মানুষের নিজের সিদ্ধান্ত। তাই কিয়ামতের দিন সে দাঁড়িয়ে বলবে, সে প্রতারণা করেছে, আর মানুষ নিজের ইচ্ছায় তার অনুসরণ করেছে। তখন আর ফিরে আসার কোনো সুযোগ থাকবে না।

এই সত্য থেকে শিক্ষা হলো—আজকের একটি ছোট গাফিলতি ভবিষ্যতের বড় পতনের কারণ হতে পারে, আবার আজকের একটি ছোট নেক আমল চিরস্থায়ী মুক্তির পথ খুলে দিতে পারে।

এই বইয়ে উক্ত বিষয়গুলো কুরআন, সহীহ হাদীস ও গ্রহণযোগ্য তাফসীরের আলোকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠক শয়তানের কৌশল, তার প্রভাব এবং তা থেকে আত্মরক্ষার বাস্তব উপায় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে অনুপ্রাণিত হন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হক বুঝার, হক অনুযায়ী আমল করার এবং শয়তানের সকল ধোঁকা থেকে হিফাজত থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

২৪. ব্যবহৃত রেফারেন্সসমূহ

•কুরআনুল কারীম (শয়তানের কৌশল, ওয়াসওয়াসা, মানবজীবনে প্রভাব ও আত্মিক সুরক্ষা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ)

•হাদীস গ্রন্থ

সহীহ আল-বুখারী (৩২৮১, ৫০৮৭, ৬৬০)

সহীহ মুসলিম (৯১, ২১৭৫, ২৫৮৮)

•তাফসীর গ্রন্থ

তাফসীর ইবনে কাসীর

তাফসীর আল-জালালাইন

•আকীদা ও নৈতিকতা গ্রন্থ

তালবীস ইবলিস — ইমাম ইবনুল জাওয়াযী রহ.

•সমকালীন ইসলামিক বই

-শয়তানের চক্রান্ত — উমার সুলাইমান আল-আশকার

-জ্বীন ও শয়তানের জগৎ

-শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তি

উপরোক্ত কুরআন, সহীহ হাদীস, তাফসীর ও প্রামাণ্য ইসলামিক গ্রন্থের আলোকে শয়তানের কৌশল, মানবজীবনে তার প্রভাব এবং আত্মিক সুরক্ষার বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।